স্বপনবুড়োর
কৌতুক
কাহিনী

ছোটদের হাসির গল্প লেখা বেশ কঠিন। লেখকের সংখ্যাও বড্ড কম। স্বপনবুড়োর ছদ্মনামে অখিল নিয়োগী ছিলেন তেমনই সেই কম সংখ্যক লেখকের একজন, যাঁর কলমে ছোটদের প্রাণখোলা হাসি আর দমফাটা মজা ফুটে উঠত অবলীলায়।

মজাদার ৮টি গল্প। নিতবরের নাকাল, সেয়ানে-সেয়ানে, চেখে দেখা, ও আমি আগেই জানতুম, নেমন্তন্ন নাও বাগিয়ে, বেড়ালের বোনপো, পরীক্ষা কী ঝকমারি, পুজোর উপহার আর মন্দির প্রবেশ। প্রত্যেকটাই এক-একখানা অঢেল হাসির উড়নতুবড়ি!

কিংবদন্তি শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর ছবি পাল্লা দিয়েছে গল্পের সঙ্গে।

স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনি
পত্র ভারতী

স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী

স্বপনবুড়োর কৌতুক কাহিনী

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম বিদ্যোদয় প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৬
প্রথম পত্র ভারতী প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

SWAPANBUROR KOUTUK KAHINI
Comic-stories
by
Swapan Buro

ISBN 978-81-8374-327-3

প্রচ্ছদ-নবরূপায়ণ সুদীপ্ত মণ্ডল
অলংকরণ শৈল চক্রবর্তী

মূল্য
১০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com www.bookspatrabharati.com
visit @atom www.facebook.com/ Patra Bharati
Price ₹ 100.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

ছেলেবেলায় পড়া কিছু-কিছু বই অর্ধশতক পেরিয়েও স্মৃতিতে অমলিন থাকে। বইখানা খুঁজে পেলে মুহূর্তে ফিরে যাই শৈশবে।

স্বপনবুড়োর কৌতুক-কাহিনী প্রথম পড়ি মাত্র পাঁচ বছর বয়েসে। ওই বয়েসে হেসে গড়িয়ে পড়েছিলুম, দিব্যি মনে আছে।

আমাদের সাবেক এবং অধুনালুপ্ত বিদ্যোদয় লাইব্রেরী থেকে বইখানা বেরিয়েছিল। তার পরেও কতবার যে পড়েছি, বন্ধুদের পড়িয়েছি। অনেক-অনেক বছর পরে, বাড়ির লাইব্রেরি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে এই বইটি হাতে এসে পড়ল।

মনে হল, যেন 'হারানো গুপ্তধন' হাতে পেলুম। দীর্ঘদিন বইটি অমুদ্রিত। দুষ্প্রাপ্য। বড় ইচ্ছে হল, একালের সববয়েসি ছোটদের হাতে আবার তুলে দিতে।

ভালো লাগলে আমার খুব 'হাসি' পাবে!

২৪ জানুয়ারি ২০১৫
কলকাতা ৭০০০০৯

নিতবরের নাকাল

একটা নিখুঁত-নিটোল নেমন্তন্ন পেতে কার না ভালো লাগে?

গোঁদল আপন মনে সেই কথাটাই ভাবছিল।

রোজকার একঘেয়ে জীবন থেকে—একেবারে আলাদা! রোজকার গতানুগতিক জীবন যদি ধূ-ধূ মরুভূমি হয়,—তাহলে একটা নেমন্তন্নের দিন হচ্ছে—মরূদ্যান। টলটলে জল, চারদিকে ছায়াঘন বিশ্রামের জায়গা। হাত-পা মেলে দু'দণ্ড আরামে বিশ্রাম করা যায়। ঝিরঝিরে হাওয়ায় গড়িয়ে নেওয়া যায় ক্লান্ত দেহটাকে।

এমনি একটা আস্তো-পুরুষ্টু-পাকা নেমন্তন্ন গোঁদলের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে হাজির হয়েছে।

নিত্য তিরিশ দিনের আলু, ডাঁটা-চচ্চড়ি আর বিউলির ডাল নয়। এ একেবারে ঘৃতপক্ক—রাজভোগ। কোনও সাহিত্যসভার শেষের মিয়োনো তেলেভাজা দুখানা বাসি শিঙাড়া আর এক কাপ চা নয়। বরযাত্রীর বহু

আকাঙিক্ষত ভূরিভোজ।

পোলাও, কালিয়া, কোর্মা, ফ্রাই থেকে শুরু করে জলযোগের দই, দানাদার, দরবেশ, সন্দেশ, রাজভোগ, চাই কী রাবড়ি অবধি।

একটা জমজমাট নেমন্তন্ন খেতে গেলে—তার জন্য প্রস্তুতি চাই অন্তত পনেরো দিন। যেমন নাকি ফুটবল ম্যাচ খেলতে গেলে—বেশ কিছুদিন ধরে প্র্যাকটিশ করতে হয়। একটা রবীন্দ্র-জয়ন্তী করতে গেলে—গায়ক-গায়িকাদের বাড়ি ধরনা দিতে হয়; কিংবা পাড়ার বেকার ছেলেদের নিয়ে 'বঙ্গে বর্গী' নাটক অভিনয় করতে গেলে—নিদেনপক্ষে দুমাস ধরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে হয়। পাড়ার লোকেদের অনিদ্রা রোগই যদি না হল তাহলে আর নাটকের রিহার্সেল কী?

এই সব ভালো ভালো কাজের জন্যে চাই সময়, চাই মহলা। আর একটা মনোমতো নেমন্তন্ন খেতে গেলে তার জন্যে কিছু পরিশ্রম করতে হবে না?

কথায় বলে, সবুরে মেওয়া ফলে।

গোঁদল মনে মনে একটা হিসেব কষতে বসে গেল। বিয়েটা হচ্ছে ওর পিসিমার বড় ছেলের। পিসেমশাই

যদিও বেঁচে নেই, তবু পিসির হাতে বহু টাকা—এই কথাই সকলের মুখে মুখে ফেরে। মাসির বাড়ি যদিও নয়, তবু পিসির বাড়িকেও হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আর তাছাড়া এই পিসতুতো দাদা হালে একটি বড় চাকরি পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে মেয়ের বাপেরা ছুটে এসেছে—কাশ্মীর থেকে কালীঘাট অবধি। এই বিয়েকে কেন্দ্র করে গোঁদল যে কত রকমের ছবি দেখেছে—তার হিসেব লিখে শেষ করা যায় না। কোনওটা লম্বা, কোনওটা বেঁটে, কোনওটার পটল-চেরা চোখ, কারও বা আলু-চেরা আঁখি! এই সব রকমারি ফটো দেখে দেখে গ্রীষ্মের ছুটিটা মন্দ কাটেনি ওদের।

পিসিমার ছোট মেয়ে ধুঁধুল গোঁদলের সমবয়েসি। দুজনের জমত বেশ ভালো। এক-একটা কনের ফোটোর এক-এক রকম নামকরণ করত ওরা। ধুঁধুল যদি একটির নাম দিত ইঁদুর-মুখী, গোঁদল পরবর্তী কনের নামকরণ করত—থ্যাবড়া নাকী।

এই ভাবে—হোঁদল কুঁতকুঁত, ট্যাঁড়স সেদ্ধ, বানর নড়ি, আলু ভাতে, করলা-মুখী, মুটকেশ্বরী, এঁচোড়-আঁখি, বড়বটি সুন্দরী, থোড় প্যাকাটি, মোচা

চিবুক...প্রভৃতি মজাদার নাম ফোটোর পিছনে লিখে সেগুলি বাড়িসুদ্ধ লোককে দেখিয়ে বেড়াত।

তাই নিয়ে সকলের হাসাহাসির অন্ত ছিল না।

অবশেষে কনে পছন্দ হল, আর শুরু হল নেমন্তন্ন বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি পর্ব।

গোঁদল গর্বে যেন দশ হাত হয়ে উঠল। ধুঁধুলকে ডেকে বললে,—এইবার দেখবি বরযাত্রী কাকে বলে! এমন মেকআপ নেব যে তোদের সিনেমার যত সব অধম কুমারের দল—একেবারে কুমড়ো-পটাশ হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি যাবে—

ধুঁধুল ফোড়ন কেটে জবাব দিলে,—আর তুমি তো শুধু বরযাত্রী নও, একেবারে যাকে বলে নিতবর। তোমার সাজ-সজ্জা হবে সম্পূর্ণ আলাদা। কনের বাড়ির লোকেদের তোমার পোশাক দেখে তাক লেগে যাবে!

গোঁদল ভেবে দেখলে ধুঁধুল ঠিক কথাই বলেছে।

নিতবর তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! বিয়ে বাড়িতে বরের ঠিক পরেই তার স্থান। আদর-আপ্যায়নও ঠিক সেই রকম জুটবে।

পরদিন থেকেই গোঁদল মনোমতো পোশাক সংগ্রহে

মনোনিবেশ করলে। প্রথমেই একটা আদ্দির পাঞ্জাবির অর্ডার দিয়ে এল নামকরা এক দর্জির দোকানে। এই আদ্দির পাঞ্জাবি তৈরি হয়ে আসবে, তাকে ডাইং ক্লিনিং-এ কাচিয়ে নিতে হবে; তারপর গিলে করিয়ে নিতে হবে পাড়ার গোবর্ধনকে দিয়ে। গোবর্ধন গিলে করে ভারি চমৎকার। এই পাঞ্জাবি পরে ওকে কেমন দেখাবে—মনে মনে ছবি এঁকে নিলে গোঁদল। হ্যাঁ, নিতবর মানাবে বেশ। শান্তিপুরী মিহি ধুতির ব্যবস্থা করতেও ভোলেনি গোঁদল।

ধুতি দেখে গোঁদলের বন্ধু ভণ্ডুল, ফোড়ন কাটলে,—শুধু জামাকাপড়েই তো আর ভদ্র হওয়া যায় না। ওদিকে মাথাটাকে যে একেবারে কাকের বাসা করে বসে আছিস!

—ঠিক! ঠিক-ঠিক! মাথাটা সংস্কার করতে হবে। আজকাল কলকাতার অলিতে-গলিতে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। আর গোঁদলের মাথাটাই সংস্কৃত হবে না? কাকের বাসা তৈরি করে রাখবে মিছি মিছি? কখনোই নয়।

নাহি চলে গেলে নব্য-সেলুনে—

সকল ফ্যাসান হবে যে আলুনে!

গোঁদল পরদিনই ধর্মতলার একটি ফ্যাসানের-আড়ত-সেলুনে চৌদ্দ আনা-দু'আনা ছাঁটিয়ে এল!

পাড়ার লোকে তার সেই তাজ্জব-ফ্যাসান দেখে হাসবে কী কাঁদবে বুঝতে পারে না।

গোঁদল কিন্তু এতটুকু দমে না! মুচকি মুচকি হেসে বলে —হুঁ—হুঁ! এ বাবা নিতবরের নয়া ফ্যাসান। তোমরা এর মর্ম বুঝবে কী?

গোঁদল আপন মনে কাজ গুছিয়ে চলে।

সকলের সকল কথা শুনতে গেলে আবার বোকা বনতে হয়। সে বাপ-ব্যাটার ঘোড়ায় চড়ার গল্পটা ভালো রকমই জানে।

ধুঁধুল মাঝে মাঝে খবর-বার্তা নেয়।

—নিতবরের পোশাক কী রকম তৈরি হচ্ছে?

—বাঃ, চুল ছাঁটাই তো চমৎকার হয়েছে!

—জুলফিটা কিন্তু একটু বাঁকা হবে।

এই ভাবে ছোট্ট ছোট্ট টিপ্পনী কেটে প্রেরণা জোগায় ধুঁধুল। বিয়ের আর দু'দিন মাত্র বাকি।

ধুঁধুল হঠাৎ ধরে বসল গোঁদলকে—

—দেখি নিতবরের নতুন জুতোটার কেমন কাট হল?

গোঁদল আমতা-আমতা করে এড়িয়ে যেতে চায়—

—মানে, আমি ভাবছিলুম স্যাণ্ডেলটা পরেই—মানে খুব পুরোনো নয় তো ওটা—

এইবার খিল খিল করে হসে ওঠে ধুঁধুল। মনে হল—কয়েকটি কাচের বাসন খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ল।

মুখ কাচু-মাচু করে গোঁদল জিগ্যেস করে,—তবে কি নতুন জুতোই কিনতে হবে রে ধুঁধুল?

ধুঁধল মাথা দোলাতে থাকে।

—সে কথা আবার জিগ্যেস করছ গোঁদল? মনে হচ্ছে তোমার মগজের বুদ্ধির শিরা-উপশিরাগুলো সব জট পাকিয়ে গেছে। নিতবর হওয়ার আগে তুমি একবার ডাক্তার দেখিয়ে ফেলো।

গোঁদল নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নেয়।

—তাই তো! তুই যে একেবারে ভাবিয়ে দিলি ধুঁধুল! আর মাত্র দুটো দিন আছে!

ধুঁধুল আবার হেসে ওঠে।

—না, গোঁদল। তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা ছিল। এখন দেখছি তুমি সেকেলে হয়ে যাচ্ছ। সাদা নাগরা, কিংবা শান্তিনিকেতনী চটি না হলে এ যুগের নিতবরকে কখনও মানায়? আর সময় নেই বলছ! পয়সা খরচ করলে এই কলকাতা শহরে বাঘের দুধ মেলে। অত কুনো হয়ে থাকলে কখনও কাজ হয়?

এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে ধুঁধুল আড়চোখে গোঁদলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

নিজের বোনের কাছে ছোট হবে গোঁদল? সে বান্দাই সে নয়। থাকনা দুটো দিন বাকি। জরির কাজ করা সাদা নাগরাই সে কিনে নেবে! আদ্দির পাঞ্জাবির সঙ্গে যা ম্যাচ করবে! ইতিমধ্যে একটা মুগার কাজ করা উড়নিও কিনে নিয়েছে সে। রকমারি নকশা কাটা রুমাল, তাও সে সংগ্রহ করেছে এক ডজন। কন্যাযাত্রীদের সামনে কথায় কথায় মুখ মুছতে হবে। সে ক্যারামতি দেখাতেও কার্পন্য করবে না সে।

তারপর এল সেই নিতবর সাজবার ঐতিহাসিক দিন।

আগেরদিন রাত্তিরে ঘুম হয়নি গোঁদলের। ক্রমাগত ছেঁড়া-ছেঁড়া টুকরো-টুকরো স্বপ্ন দেখেছে সে। তার ফ্যাশানের কায়দা দেখে কনের বাড়িতে কীরকম কানাকানি শুরু হয়ে গেছে। এমনকী এক সময় কনে সুদ্ধু, বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে জিগ্যেস করেছে— তুমি আমার ঠাকুরপো বুঝি?

জবাব দিতে গিয়ে গোঁদল এমন বিষম খেলে যে, গোটা বাড়িতে হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেল। তারপর আনো পাখা—আনো জল—আনো ডাক্তার—গেলাও ওষুধ।

লজ্জায় গোঁদল আর কনের দিকে তাকাতে পারে না। কনে কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে!

নাঃ, স্বপ্নের কথা সে আর ভাববে না। সকাল থেকেই প্রসাধনের পালা শুরু হল।

মাথায় সাবান ঘষতে হল এক ঘন্টা ধরে। সত্যি কথাই তো! নিতবর হবে একটু উদাস-উদাস কবি-কবি ভাবের। নইলে তাকে মানাবে কেন?

দুপুরবেলা এক ফাঁকে গিয়ে গোবর্ধনকে দিয়ে

শান্তিপুরী ধুতি কোঁচানো আর আদ্দির পাঞ্জাবি গিলে করার পালা সাঙ্গ করতে হল।

তারপর রয়েছে—সাদা জরির কাজ করা নাগরা পায়ে দিয়ে খানিকটা হাঁটা-চলা করা। ওদের লম্বা বারান্দায় জুতো পরে বেশ খানিকটা পায়চারি করতে হল। নইলে বিয়েবাড়িতে গিয়ে বিপদে পড়তে হবে।

বেলা তিনটে থেকে শুরু করতে হল—চুল ইস্তিরি করা। আর ওর মাথার চুলগুলোও হয়েছে এমন বেয়াড়া যে, ডাইনে চিরুনি চালালে বাঁ দিকটা কী রকম উঁচু হয়ে থাকে! জল দিয়ে ভিজিয়ে খানিকটা মনোমতো হয় বটে, কিন্তু শুকিয়ে গেলে যে-কে-সেই! মাথায় মাখবার 'পমেড' আনা উচিত ছিল। কী ভুলই সে করেছে!

তারপর মুখে স্নো-পাউডার মাখবার ব্যাপারটাই ধরো। যত যত্ন করে মাখতে যায়—তত ঘামে জবজবে হয়ে ওঠে।

স্নো মাখো,—চাপাও পাউডার। পাউডার ভিজে উঠল, তাই আবার সব মুছে ফেলে দিয়ে নতুন করে সেই মুখে চুনকাম করো।

কী করে যে সে ম্যানেজ করবে—কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। হেসে-কেঁদে ঘেমে সে একেবারে যেন নেয়ে উঠল।

আবার ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে গিয়ে আর এক বিতিকিচ্ছি কাণ্ড! এর আগে সে ব্যাপারটা লক্ষ করেনি। ধুতি কাচিয়েছে এক জায়গায়, আর পাঞ্জাবি ধুতে দিয়েছিল অন্য একটা ডাইং ক্লিনিং-এ! কী কাণ্ড বলো দেখি, ধুতির সঙ্গে জামা আদপেই মিলছে না। এই নাপতে সাজ নিয়ে সে কী করে বরযাত্রী যাবে।

সত্যি, তার কান্না পেতে লাগল। নাঃ, আর কাঁদলেও ওলট-পালট করবার উপায় নেই। এই ধুতি-জামা পরেই নিতবর সাজতে হবে।

তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে রাখলে গোঁদল।

ধুতি-জামা ধোলাইয়ের ত্রুটিটা দামি সেন্ট মেখে ঢেকে ফেলতে হবে। গোঁদল জানে তার কাকাবাবুর ঘরে প্যারিসের দামি 'সেন্ট' আছে। পা টিপে টিপে সেই ঘরে গিয়ে হাজির হল শ্রীমান। সব সময়ই ঘরটা যেন একটু অন্ধকার। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। কী জানি কখন

কাকাবাবু আবার ঘরে এসে ঢুকে পড়বে। এমনিতেই তো রাগি মানুষ; তার ওপর ভাইপোর কীর্তি দেখলে রাগে একেবারে অগ্নি-শর্মা হয়ে যাবে।

ছিপিটা খুলে—বেশ খানিকটা সেন্ট ছড়িয়ে দিলে আদ্দির পাঞ্জাবিতে।

কিন্তু এ কী বদ গন্ধ রে বাবা? অন্নপ্রাশনের ভাত অবধি উঠে আসতে চায় যে!

বাইরে এসে গোঁদল নিজের ভুলটা বুঝতে পারলে! সেন্টের বদলে সে ক্যাস্টর অয়েল ছড়িয়ে দিয়েছে সারাটা জামায়। এখন উপায়?

এই খুশবু নিয়ে সে কী করে বিয়ে বাড়িতে হাজির হবে?

ছাদের হাওয়াতে মেলে দিলে যদি গন্ধটা কিছু কমে—এই মনে করে সে ছাদে গিয়ে হাজির হল। ইতিমধ্যে রোদ পড়ে এসেছে—সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারদিক থেকে। ঝির ঝির করে হাওয়া বইছে বটে।

ছাদের দড়িতে জামাটা মেলে দিয়ে সে এক কোণে আরাম করে বসল।

উঃ! সারাদিনের ছুটোছুটিতে শরীরের ওপর দিয়ে কি কম ধকল গেছে! সন্ধেবেলার দক্ষিণা হাওয়াটা কী মিষ্টি।

গোঁদল যে কখন ছাদের এক কোণে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে—নিজেও জানতে পারেনি!

একটা প্যাঁচার ডাকে ওর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকিয়েই দেখে—সারা আকাশময় রাশি রাশি তারা। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে কিছুই বুঝতে পারে না।

দড়িতে যে জামাটা টাঙিয়ে দিয়েছিল—সেটা ধুলোতে লুটোপুটি খাচ্ছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পাঞ্জাবিটা বেশ করে ঝেড়ে নিলে; তারপর সেটা গায় দিয়ে তর তর করে নীচে নেমে এল।

কী সর্বনাশ! সাড়ে আটটা বেজে গেছে যে! সাড়ে ছয়টার সময় বরযাত্রী দলের রওনা হওয়ার কথা। এতক্ষণ কি আর তারা ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে? নিতবরের জন্য কি আর বিয়ে আটকে থাকবে?

বরকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত—

নিতবরের কথা আর কে ভাবছে বলো?

নতুন কেনা সাদা নাগরা জুতোটা পায়ে গলিয়ে

গোঁদল পই-পই করে ছুটল পিসির বাড়ির দিকে। ধুঁধুলটা যদি ওর জন্যে অপেক্ষা করে।

আরও খানিকটা চলবার পর সে হাঁপিয়ে উঠল।

আজ সন্ধ্যায় কলকাতা শহরের ট্রাম-বাস সব ধর্মঘট করেছে নাকি? একটা ট্যাক্সির পর্যন্ত দেখা নেই। নাই বা থাকল পকেটে পয়সা! পিসিমার বাড়ি পৌঁছে ভাড়া চেয়ে নিয়ে দেওয়া চলত।

পাগলের মতে ছুটতে লাগল গোঁদল। রাস্তার কয়েকটি লোকের সঙ্গে ধাক্কাও খেলে।

অভদ্র—ইতর—চোখে দেখতে পাও না? ইত্যাদি মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে সম্ভাষণ জানালে তারা। ওদিকে আবার নতুন জুতো। দুটো পায়েই যেন গনগনে আগুন! ফোসকা পড়েছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু থামবার আর কোনও উপায়ই নেই। মরিয়া হয়ে পা চালিয়ে চলেছে গোঁদল।

তেষ্টায় বুক কাঠ করে আর সারা দেহ ঘামে ভিজিয়ে গোঁদল যখন পিসির বাড়িতে হাজির হল—তখন বাড়ির পুরোনো ঝি নিস্তারিণী বরযাত্রীদের জলখাবারের এঁটো প্লেট আর সরবৎ-এর গেলাসগুলো

গুছিয়ে তুলছিল।

সে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে গোঁদলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর চোখ দুটো কপালে তুলে, হুঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে,—হেঁই মা! তুমি এতক্ষণে এলে দাদাবাবু! পাশের বাড়ি ফচকে ছোঁড়া ফটকেকে নিতবর করে ওরা কখুন বেরিয়ে গেছে!

গোঁদলের মনে হল, তার মাথায় কে যেন এক বালতি গোবরগোলা জল ঢেলে দিলে।

তবু আশার কথা—ওপর থেকে ধুঁধুলের গলা পাওয়া গেল।—এতক্ষণে নিতবরের ঘুম ভাঙল!

ধুঁধুল তাহলে ওর জন্য অপেক্ষা করছে!

তাহলে এখনো বিয়ে বাড়ি যাওয়ার আশা আছে! দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে গোঁদল লাফাতে লাফাতে দোতলায় ছুটলে।

রেলিংয়ের এক কোণে ছিল একটা পেরেক। তাতে আটকে গিয়ে নতুন শান্তিপুরী ধুতিটা একেবারে ফ্যা-স্ করে ছিঁড়ে গেল!

ওপরে দাঁড়িয়ে একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠলেন পিসিমা—

কী দস্যি ছেলে বাবা! হাতে-পায়ে একেবারে নক্ষ্মী! তা এতক্ষণ কোন রাজকার্য ছিল শুনি?

ওপরে উঠতেই ধুঁধুল নাকে আঁচল দিয়ে চিৎকার করে উঠল, উঃ! কোন শ্মশান থেকে ঘুরে এলে শুনি? গায়ের গন্ধে যে ভূত পালায়!

থপ করে সেইখানেই বসে পড়লে গোঁদল। একে—একে তার নাকালের কাহিনি সবিস্তারে জানালে পিসিমা আর ধুঁধুলকে!

ধুঁধুল বললে,—এখনও ক্ষীণ আশা আছে ভাই গোঁদল। পিসেমশাই খবর পাঠিয়েছেন—তিনি মা-র সঙ্গে দেখা করে একটু রাত্তিরে বিয়ে বাড়ি যাবেন! কাজেই তুমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারো। কিন্তু জেনে রাখো, তোমার নিতবরের চাকরি গেছে! পাশের বাড়ির ফটক সেই পদ পেয়ে দিব্যি সেন্ট মেখে চলে গেছে।

সেন্টের নামে গোঁদলের কান্না পেতে লাগল। ক্যাস্টর অয়েলের গন্ধ এখনও গা থেকে যায়নি! কী বিচ্ছিরি খুশবু রে বাবা—

পিসিমা বললেন,—ওই ছেঁড়া ধুতি পরে আর

কুটুমবাড়ি যেতে হবে না। আবার একখানা ধোয়া থান কাপড় পরে নে।

কোথায় শান্তিপুরী ধুতি,—আর কোথায় পিসিমার থান! এত দুর্গতিও তার কপালে লেখা ছিল! তাই সই।

তবু বিয়ের নেমন্তন্নটা তো মাঠে মারা যাবে না!

এমন সময় ক্রিং-ক্রিং করে ফোনটা বেজে উঠল। ধুঁধুল তাড়াতাড়ি করে ছুটে গেল ফোন ধরতে।

ফিরে এসে জানালে, পিসেমশায়ের গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে। তাই তিনি বাসে সোজা কনের বাড়ি চলে গেছেন।

পিসিমা বললেন, তবে আর কী? আমি না হয় তোলা-উনুনে তোদের দুজনকে ভাতে ভাত রান্না করে দিই—। রাত উপোসি তো আর থাকতে পারবি নে তোরা।

সত্যি, গোঁদলের পেটে তখন ইঁদুর ডন দিচ্ছে।

সেয়ানে-সেয়ানে

বিরিঞ্চি বটব্যাল আর গণ্ডূষ গায়েন।

একই পাড়ায় দুজনের বাস। বয়েসটাও উভয়ের কাছাকাছি। তাই বন্ধুত্বটাও ঘনীভূত হয়েছে।

বয়েস যখন অল্প থাকে তখন জীবনের নানা রঙিন স্বপ্ন মানুষে দেখে। হাতটাও তাই একটু দরাজ থাকে। কারণে অকারণে দু'পয়সা বেশি খরচ করে ফেলে। কিন্তু বিরিঞ্চি বটব্যাল আর গণ্ডূষ গায়েন সেই অলীক স্বপ্ন দেখার বয়েস পেরিয়ে এসেছে। পয়সা জমিয়ে আনি, এবং আনি সঞ্চয় করে কী ভাবে টাকা তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে দুজনেই বিশেষ ওয়াকিফহাল হয়ে উঠেছে।

তাই উভয়ের জীবনের বন্ধুত্বও যেমন ঘন, আবার প্রতিযোগিতাও তেমনি তীব্র।

আবার এই প্রতিযোগিতাটা জমে ওঠে রোজকার বাজার করার ব্যাপারে। কে কত সস্তায় বাজার করে আর এক বন্ধুর চোখ ফুটিয়ে দিতে পারে—এই নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে প্রত্যহ।

গলির মোড়ে দেখা হয়—বিরিঞ্চি বটব্যাল আর

গণ্ডূষ গায়েনের।

বটব্যালের মুখে-চোখে বুদ্ধিমানের হাসি।

—কী হে গায়েন, আজকের বাজারটা কেমন হল?

গণ্ডূষ গায়েনও কম যায় না। ডান চোখটা নাচিয়ে জবাব দিলে,—হুঁ। অন্ধি-সন্ধি জানা থাকলে সুলভে বাজার করা আটকায় কে? এই আজকের কথাই ধরো না কেন? আড় মাছের মুড়ো কেউ ছুঁয়েও দেখছিল না। দুটো মিষ্টি কথা বলে, আর দুটো পয়সা ঠেকিয়ে দিয়ে দিব্যি বাগিয়ে নিলাম। পারুক দেখি আর কে পারবে—

বাঁকা চোখে বিরিঞ্চি বটব্যালের দিকে তাকায় গণ্ডূষ গায়েন। প্রথমে একটা ঢোক গিলে ফেলেছিল বটে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সে সামলে নিলে। একটা অম্ল-মধুর রসিকতার আমেজ এনে কৌতুকের সুরে বললে,—কিন্তু আনাজ তরকারি? তাতে আমায় ঠকাতে পারবে না ভায়া। পল্লী অঞ্চলের একদল চাষি অনেক তরিতরকারি লাউ-কুমড়ো আর শাক-পাতা নিয়ে এসেছিল বাজারে।

—তারপর?

গোল-গোল হয়ে ওঠে গণ্ডূষ গায়েনের দুটি চোখ।

বটব্যাল বললে,—সেরেফ এই পৈতে দেখিয়ে কাজ হাসিল করে এলাম ভায়া। চোখ-কান বুজে বলে

ফেললাম—অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন হচ্ছে বাড়িতে। কত ভক্তের পায়ের ধুলো পড়বে। এই সৎকাজে আমার কাছ থেকে পয়সা নিবি তোরা?

গণ্ডূষ গায়েন রুদ্ধবাক হয়ে বন্ধুর কথা শোনে। তারপর প্রশ্ন করে বসল,—অ্যাঁ! মুখের কথাতেই বিনি পয়সায় জিনিস দিলে?

বটব্যাল ডান হাতে পৈতেটা জড়িয়ে নিয়ে সামনের দিকে হাতটা উঁচু করে তুলে ধরে উত্তর দিলে,—দেবে না মানে? এ একেবারে ব্রহ্মতেজের ব্যাপার। ওরা বললে,—ঠাকুর, সব ঝুড়ি থেকে কিছু কিছু তুলে নিয়ে যাও। আমিও কাজ হাসিল করে বললাম,—জয়স্তু।

মাইরি, কী এনেছিস দেখি—

বটব্যাল বড় থলেটার মুখ একটুখানি ফাঁক করে দেখিয়ে ফিক ফিক হাসতে লাগল।

গণ্ডূষ গায়েনের মনে হল—তার আনা আড় মাছের মাথা দুটো একেবারে বিস্বাদ তেতো হয়ে গেছে!

এমনিভাবে চলে দুই বন্ধুর পয়সা বাঁচানোর প্রতিযোগিতা। কে পোস্তা থেকে সস্তায় আম এনেছে, আর কে বৈঠকখানা বাজার থেকে নামমাত্র মূল্যে মাছ নিয়ে এসেছে—এ নিয়ে বাকযুদ্ধ লেগেই আছে—

বটব্যাল আর গায়েনের।

কিন্তু বাগিয়ে আনবার ব্যাপারে দুজনেরই হাতযশ বহুবিস্তৃত। কাজেই কেউ কাউকে সহসা হারিয়ে দিতে পারে না।

ওদের আরও একটা ব্যাপার নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে। কে কার বাড়িতে আগে গিয়ে চা পান করতে পারে!

বাড়িতে গিয়ে হাজির হলে—নিদেনপক্ষে এক কাপ চা দিতেই হবে। সারা মাসে কে অন্যের বাড়িতে বেশি কাপ চা খেয়ে নিতে পারবে তাই নিয়ে তুমুল কাণ্ড চলে।

মাসের শেষে এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে হিসেব করে দেখায়। হিসেবে যে হেরে যায়ে—সে দুদিন মনমরা হয়ে বসে থাকে। আবার নতুন করে জব্দ করবার ফন্দি আঁটে।

আর একটি বিষয় নিয়ে ওদের রেষারেষির অন্ত নেই। সেটি হচ্ছে—কার ধুতি কত মাস টেকে?

বটব্যাল কোনও দিন আটহাতি ধুতি ছাড়া কেনে না। আর সেই ধুতি কিনতে সে কলকাতার সমস্ত ফুটপাতের দোকান চষে ফেলে! একটু-টুটা-ফুটা থাকলে বেশ কম

দামে বাগিয়ে নিয়ে আসে। বন্ধুকে সেই ধুতি হাত নেড়ে নেড়ে দেখায়।

গায়েন কিন্তু আরও এক কাঠি সরেস।

আপন মনে বিড়বিড় করে বলে, তুমি ফেরো ডালে ডালে, আর আমি ফিরি পাতায় পাতায়।

গায়েন সোজা চলে যায় হাওড়ার হাটে। সেখান থেকে পাইকারি দরে নিয়ে আসে বড় গামছা। খুব টেকসই। সেটা লুঙ্গি-কে লুঙ্গি গামছা-কে-গামছা। এক সঙ্গে দুই কাজ চলে।

আপন মনেই ফোড়ন কাটে গায়েন,—দেখি, আমার সঙ্গে কে কম্পিটিশনে আসবে—এসো! হুঁ-হুঁ ব্বাপ! এ হাওড়া হাটের মাল! কলকাতার ফুটপাথের ওঁছা-জিনিস পাওনি। টেকসই বলে একে!

তারপর নিজের খুশিতেই মাথা নাড়তে থাকে।

কিছুদিন বাদে আবার দুই বন্ধুর মনের মিতালি গাঢ় হয়ে উঠল। দুজনের ঘরের দরজা বন্ধ করে কাগজে পেন্সিলে কী সব অঙ্ক করে চলেছে?

ব্যাপার কী? আবার নতুন করে অঙ্কের পরীক্ষা দিতে হবে নাকি পাঠশালায়? পাড়ার লোকের কৌতূহলের সীমা নেই।

শেষকালে জানা গেল—বটব্যাল আর গায়েন মিলে মাছের ব্যবসা করবে। ওর দুজনে পাড়ায় যৌথ কারবার চালাবে। উপায় অতি সোজা। শেষ রাত্তিরে গিয়ে পাতিপুকুর থেকে সস্তায় মাছ কিনে নিয়ে আসবে আর পাড়াতে তাই বাজার-দরে চালাবে। পাড়ার লোকের সুবিধে—তারা বাড়িতে বসেই প্রত্যহ টাটকা মাছ পাবে। সকালবেলা বাজারে যাওয়ার ঝামেলা পোওয়াতে হবে না। অন্যান্য দরকারি সওদা সন্ধের পর কিনে রাখলেও চলে। শুধু টাটকা মাছের জন্যেই যা বাজারে যাওয়া। অফিস-আদালত সবাইকারই আছে। মাছের ঝোল ভাত না হলে বাঙালির পেট ভরে না। মাসের শেষে হিসেব করে টাকা চুকিয়ে দিলেই হবে।

পাড়ার লোক এই প্রস্তাবে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করলে—বটব্যাল আর গায়েনকে।

প্রথম সুবিধে মাছ খেতে নগদ পয়সা লাগছে না। মাসের শেষে মাইনে পেয়ে টাকা শোধ করলেই চলবে। আর দ্বিতীয় সুবিধে বাজারে না গেলেও রোজ রান্নাঘরে টাটকা মাছ পৌঁছে যাবে।

বটব্যাল আর গায়েনের মাছের ব্যবসা এই ব্যবস্থায় অতি অল্প কয়েকদিনের ভেতরই খুব জমে উঠল।

সবাই হেঁকে বলে,—ওহে বটব্যাল ভাই, কালকে যা তপসে মাছ খাইয়েছ অতি অপূর্ব। স্বাদটা একেবারে মুখে লেগে রয়েছে।

আবার কেউবা মাথা নেড়ে ফিস ফিস করে মন্তব্য করে,—গায়েন ভাই, আজকের মতো টাটকা পোনা আর একদিন খাওয়াতে হবে। তাছাড়া সামনেই আমার ভাইঝির বিয়ে। সব মাছ কিন্তু তোমায় সাপ্লাই দিতে হবে।

এই সব খবর শুনে বটব্যাল আর গায়েনের চোখগুলি আনন্দে ছোট হয়ে আসে।

বন্ধ ঘরে তাদের গুজ গুজ ফুস ফুস বেড়েই চলে।

বটব্যাল-গৃহিনী বলে,—এইবার আমি একজোড়া মোটা অনন্তের ফরমাশ দোবো। তুমি সেকরাকে খবর দাও—

গায়েন-গৃহিনী চুপি চুপি স্বামীকে জানায়,—ও-সব গয়নার দিকে আমার ঝোঁক নেই। তুমি দমদমের দিকে খানিকটা জমি দেখ দেখি, মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই নিতেই হবে।

একটা দুটো মাস পেরিয়ে যেতেই বটব্যাল আর গায়েনের মাথায় টনক নড়ল।

তাইতো! পাড়ার লোকেরা প্রত্যহ মাছ খাওয়ার কাজে যেমন উৎসাহ দেখিয়েছিল, তার দাম দেওয়ার

ব্যাপারে ঠিক তেমনি নির্লিপ্ত হয়ে রইল।

অনেককে সকাল বিকেল ডাকাডাকি করেও বাসায় পাওয়া যাচ্ছে না। পয়সার জন্যে তাগিদটা করবে কার কাছে?

এরপর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠল। পাড়ার যেসব লোকের সঙ্গে বটব্যাল আর গায়েনের এক সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল, সকাল বিকেল একসঙ্গে এক রোয়াকে বসে চা পান চলত—তারাই এই দুটি প্রাণীকে ক্রমাগত এড়িয়ে চলতে লাগল। কোনও বাড়িতে মাছ পাঠিয়ে দিলে মাছ ফিরে আসে না, কিন্তু পয়সাটা যে কোন পথে আসবে তার হদিস কেউ জানে না!

এরা দুজন যদি হাঁটে এপথ দিয়ে—তাহলে অন্য সবাই ছাতা আড়ালে রাস্তা চলে। ঢুকে পড়ে এ গলি, ও গলির মধ্যে। সমুদ্রের ধারের কাঁকড়াগুলো যেমন মানুষের পায়ের শব্দ শুনলেই সুট করে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে—আর তাদের কোনও হদিসই পাওয়া যায় না—বটব্যাল আর গায়েনের কাছে পাড়ার লোকেরা তেমনি অদৃশ্য মানুষ হয়ে থাকল।

অবশেষে প্রচুর টাকা লোকসান দিয়ে দুই বন্ধু এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল যে, মাছ বিক্রি করা যত সোজা,

তার দাম আদায় করা তত শক্ত। ইতিমধ্যে সবাই আবার যথারীতি বাজারেই মাছ কিনতে শুরু করে দিয়েছে। কাজেই বাকি-বকেয়া শোধ দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

বটব্যাল আর গায়েন টাকার শোকে ঘরের দরজা বন্ধ করে অনশন ব্রত অবলম্বন করলে। কিন্তু দেখা গেল,—তাতে ক্ষিদের জ্বালায় পেটেই শুধু মোচড় দেয়—কেউ একটি পয়সা অবধি দেওয়ার নাম করে না।

তখন বাধ্য হয়ে—ছেড়ে দিলেন পথটা, বদলে গেল মতটা—এমন অবস্থাতে পড়লে সবারই মত বদলায়।

কিন্তু টাকার শোকে আর কাঁহাতক ঘরে বন্ধ থাকা যায়। অবশেষে ওরা দুজনে ঠিক করলে—রোজকার ব্যাপারে খরচ কমিয়ে লোকসানের ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

বটব্যাল সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট ফর্দ তৈরি করে ফেললে। কী কী পন্থায় দৈনন্দিন খরচ কমানো যায়।

যথা,—মাছ খাওয়াটা এখন বেশ কিছুদিন বন্ধ করা যেতে পারে। বাজার থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আলুর খোসা, কুমড়োর নাচা, পোকা খাওয়া বেগুন, পেঁয়াজের খোসা, ফেলে-দেওয়া ডাঁটা, জল খাওয়া ডাব, কাঁঠালের

বিচি ইত্যাদি সংগ্রহ করে এনে তরকারির সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। কয়লা বাঁচাতে দুবেলার রান্না দিনের বেলাতেই শেষ করে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। নেহাত ঠেকায় না পড়লে সন্ধের পর আলো জ্বালানো একেবারে বন্ধ করে রাখা। তাতে তেল আর ইলেকট্রিক খরচ বেঁচে যাবে। ধুতি পরা তুলে দিয়ে গামছায় কাজ চালানো। ভাত বা আটা না খেয়ে বাজরায় কাজ চালানো—

গায়েন বললে,—আমি যে ভাবে খরচ কমাব তা আমার মনে মনেই রইল। ফলেন পরিচিয়তে।

বটব্যাল মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—হুঁ! দেখি, কে বেশি খরচ কমাতে পারে।

এই ঘটনার দিন সাতেক পরের কথা। এর মধ্যে আর দুই বন্ধুর দেখা হয়নি। দুই জনেই ব্যয় সংকোচ পরিকল্পনা নিয়ে উর্বর মস্তিষ্ক পরিচালনা করছে। ফলে দুই পরিবারের লোকেই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে।

সেদিন সন্ধের একটু বাদে গায়েন এল বটব্যালের সঙ্গে দেখা করতে। গায়েন জানতে এসেছে কী ভাবে বটব্যাল খরচ কমিয়ে টাকা জমাচ্ছে। এ ব্যাপারে বটব্যালের কৌতূহলও বড় কম নয়। সেও জানতে চায়

গায়েনের খরচ কমানোর ফন্দিটা কী।

বটব্যাল দোতলা থেকে ডেকে বললে,—এসো ভায়া, এসো, আলোটা আর নাইবা জ্বাললাম। সিঁড়ির রেলিং ধরে উঠে আসতে পারবে তো?

মৃদু হেসে গায়েন উত্তর দিলে,—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তোমার বাড়ির সিঁড়ি তো আমার মুখস্ত। কতবার গুনে গুনে উঠেছি মনে নেই।

আলো জ্বালতে হল না বলে বটব্যাল ভারি খুশি হল। তাই সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আবার বললে,—এসো গায়েন, তুমি তো আমার ঘরের লোক। কত দিন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। সংসারের নানা ঝঞ্ঝাট নিয়ে মুখ তোলবার ফুরসত পাইনি। এসো, দু'জনে মিলে গল্প করা যাক।

—সেই ভালো বটব্যাল, সেই ভালো।

কথা বলতে বলতে ততক্ষণে গায়েন অন্ধকারের মধ্যে রেলিং ধরে দোতলায় উঠে এসেছে।

বটব্যাল চাপা গলায় শুধোলে,—ব্যবসায়ের কোনও কথাবার্তা নাকি? আদায়পত্র কিছু হল? আলো জ্বালতে হবে নাকি?

তেমনি ফিস ফিস করে গায়েন উত্তর দিলে,—আরে

না, না, বটব্যাল, সন্ধেবেলাটা একা একা ঘরে ভালো লাগছিল না, তাই এলাম তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে।

—বেশ কথা। বেশ কথা। তাহলে আর আলো জ্বালিয়ে দরকার নেই। এসো, এই চেয়ারটায় বসো।

অন্ধকারের মধ্যেই বটব্যাল গায়েনকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলে। গায়েন খানিকক্ষণ উসখুস করে তারপর জুতসই হয়ে সেই চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

তারপর চলল তাদের মনের কথার ঝুলি খোলা। কে কী ভাবে গিন্নির চোখে ধুলো দিয়ে পয়সা বাঁচাচ্ছে—তারই ফিরিস্তি চলল সারাটা সন্ধে ধরে।

অবশেষে দুই বন্ধুই স্বীকার করলে যে, মনোমতো পয়সা বাঁচানোটা কিছুতেই হচ্ছে না।

হঠাৎ বটব্যাল বলে উঠলে,—গায়েন ভাই, এইবার আমি রাত্তিরের খাবার খাবো। নইলে আরশুলা আর ইঁদুর ব্যাটারা সব কিছু খেয়ে নেবে। আলোটা তাহলে জ্বালাই ভাই।

বটব্যালেরা মুখে আলো জ্বালানোর কথা শুনে গায়েন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললে,—আরে রোস, রোস, আগে আমার কাপড়চোপড় সামলে নেই। তারপর

আলো জ্বেলো।

বন্ধুর কথা শুনে বটব্যাল ভড়কে গেল। ব্যাপার কী? কাপড়চোপড় সামলাবে কী?

গায়েন মৃদু হেসে উত্তর দিলে,—ভয় পেয়ো না ভাই বটব্যাল। তুমি যেমন আলো না জ্বালিয়ে ইলেকট্রিকের খরচ বাঁচাচ্ছ, আমিও সেই ফাঁকে আমার কাপড়-জামা খুলে রেখে তোমার ময়লা, ঘুণেধরা, ছারপোকাওয়ালা চেয়ারটায় বসেছিলাম পাছে জামা-কাপড় নোংরা হয়ে যায়। এইবার জামা-কাপড়টা পরেনি, তারপর তুমি সুইচে হাত দাও।

গায়েনের কথা শুনে বটব্যাল সেইখানেই থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুইচ পর্যন্ত তার হাত উঠল না!

চেখে দেখা

একটা বড় অসুখ থেকে ওঠবার পর টুবলোর খাই খাই ভাবটা বড্ড বেশি বেড়ে গেল।

সব সময়ই মনে হয় যেন পেটের ভেতর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অথচ মজা দেখো, ডাক্তারের বারণ, দুবেলা মাছের ঝোল-ভাত ছাড়া টুবলো আর কিছু খেতে পারে না। শুধু এবেলা ওবেলা ওভালটিনের সঙ্গে দুখানা করে ক্রিমকেকার বিস্কুট।

তোমরাই বলো, এতে কি রাবণের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা দূর হয়? টুবলো উপোসি ছারপোকার মতো চুপসে যেতে থাকে।

সরাসরি গিয়ে কারও কাছে হাত পাতলে—সবাই তাকে ফিরিয়ে দেবে—এ জ্ঞানের নাড়ি টুবলোর বেশ টনটনে।

কাজেই অনেক ভেবে ভেবে এক বুদ্ধি বের করলে। পাশের বাড়ির বিধবা পিসিমা নিস্তারিনী দেবী একটু বেলাতে রান্না করেন। তাঁর আবার ছানার

ডালনা, এঁচড়ের তরকারি, নারকেল বেটে বড়া—এইসব খাদ্য না হলে মুখে বড় অরুচি হয়।

টুবলো ঠিক করলে এইখানে টোপ ফেলবে। একদিন সকালবেলা এক-পা দু-পা করে হাজির হল—পিসিমার হেঁসেল ঘরে।

—পিসিমা কী করছ?

—এই কুটনো কুটছি বাবা—

—বেশ তো! তুমি রোজ কুটনো কুটবে, বাটনা বাটবে, রান্না করবে,—আর আমি তোমায় মহাভারত পড়ে শোনাব।

পিসিমা উত্তর দিলে,—সে তো ভালো কথা টুবলো। কিন্তু তুমি এই শক্ত অসুখ থেকে উঠেছ। এখন কি পড়াশোনা তোমার সহ্য হবে? তোমার মা শুনলে রাগ করবে।

টুবলো উত্তর দিলে,—না না, মা রাগ করবে কেন? বরং তোমায় মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি জানলে খুব খুশিই হবে। মহাভারত পড়লে কত জ্ঞান বাড়ে, মন কত ভালো থাকে।

এইটুকু ছেলে টুবলোর মুখে এই রকম কথা শুনে

পিসিমা ভারি খুশি। সেই দিনেই টুবলোর মাকে কথায় কথায় ছেলের গুণপনার কথা বললেন।

ছেলের মতি-গতি ফিরেছে জেনে টুবলোর মায়েরও আনন্দের পরিসীমা থাকে না। তিনি হাসিখুশি মুখে বললেন,—টুবলো আপনাকে মহাভারত পড়ে শোনাবে, সে তো আনন্দেরই কথা। তাতে তো ওরও খুব শিক্ষা হবে।

তার পরদিন থেকেই ছেলে পিসিমাকে মহাভারত শোনাতে শুরু করে। এ কাজে তার উৎসাহ কত!

মহাভারত পড়তে পড়তে টুবলো আনমনা হয়ে যায়। অবশ্য ভুলো মন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

পিসিমা হয়তো সরষে বাটা দিয়ে ঝিঙে-চচ্চড়ি রান্না করছেন। তার ঝাঁজ নাকে এসে লাগছে। সে সময় কি আর মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন পড়তে ভালো লাগে? মন আর মুখ দুই-ই তখন উৎসুক হয়ে ওঠে।

মনকে শাসন করে কোনও রকমে হয়তো আরও দু-পাতা অগ্রসর হওয়া গেল—; ইতিমধ্যে পিসিমা ঝিঙে-চচ্চড়ি নামিয়ে কাঁঠালের বিচি দিয়ে রান্না করা

ছোলার ডালে সম্বরা দিচ্ছেন। সে মধুর ঘ্রাণ সহ্য করে যে একবারও মুখে চোটকায় না,—সে হয় উন্মাদ, আর না হয় মুণি-ঋষি। এরপর আছে আবার আলু-পটল-নারকেলের ডালনা।

মহাভারতের পাতা থেকে ধ্যান ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে এই কি যথেষ্ট নয়?

পিসিমা মুখ না তুলেই জিগ্যেস করলেন—হাঁরে টুবলো, আবার থামলি কেন?

গলাটাকে আরও মোলায়েম করে টুবলো বললে—আচ্ছা পিসিমা, তুমি যেমন সুন্দর করে রাঁধো, এমন আর কেউ পারে না।

হাসতে হাসতে পিসিমা বললেন,—ওরে পাগল সারা জীবন যে এই বোকনো, কড়াই, হাতা নিয়েই কাটল। এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে, চাপিয়ে দিয়ে নেড়ে নিলেই সুন্দর সোয়াদ হয়।

টুবলো আর একটু হেসে সাহস পেয়ে বললে,—আমি যদি মাঝে মাঝে তোমার রান্না চাখতে পাই পিসিমা, তাহলে বোধ করি খুব শিগগির আমার শরীরটা সেরে যায়।

পিসিমা খুন্তি নাড়তে নাড়তে উত্তর দিলেন,—আমার কি আর তোকে কিছু দিতে অসাধ? শুধু ভাবি, তোর মা যদি কিছু মনে করে?

এইবার টুবলোর সাহস আর এক ধাপ ওপরে উঠে গেছে। গলা খাটো করে বললে,—আমি তো শুধু একটু চাখব পিসিমা, মাকে না জানালেই হবে। কিন্তু তোমার হাতে রান্না কি আমি না খেয়ে থাকতে পারি?

স্তব-স্তুতিতে ভগবান বশ হয়, আর পিসিমা তো শুধু মর্ত্যের মানুষ।

ফিক করে হেসে ফেলে পিসিমা বললেন,—আচ্ছা আচ্ছা, এই নে, একটু ঝিঙে-চচ্চড়ি আর একটু আলু-পটলের ডালনা চেখে দেখ। নুন, ঝাল সব ঠিক হয়েছে তো রে?

গোটা ডান হাতের চেটোটা চাটতে চাটতে টুবলো উত্তর দিলে, —অপূর্ব হয়েছে পিসিমা। রোজ আমি তোমায় মহাভারত পড়ে শোনাব, আর তুমি রোজ আমাকে তোমার হাতের তরকারি চাখতে দেবে।

এইবার পিসিমা আর হাসি চেপে রাখতে পারেন না। বললেন,—আচ্ছা তাই হবে রে, তাই হবে—

এই ভাবে পিসিমার সঙ্গে টুবলোর যে যুক্তি হল **তার** রসাল ব্যবহারে শ্রীমান ভয়ানক মহাভারত ভক্ত **হয়ে** পড়ল। কখন পিসিমার হেঁসেলে ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ উঠবে, আর কখন টুবলো মহাভারত হাতে হাজির হবে—এই মধুর পরিবেশের স্বপ্ন পর্যন্ত সে দেখতে শুরু করল।

টুবলোর মা একদিন ভাবলে, ছেলে যখন এত মহাভারত ভক্ত হয়ে পড়েছে—তখন একদিন গিয়ে শোনা উচিত কেমন করে শ্রীমান পুঁথি পড়ে।

পিসিমা এমনিতেই দেরি করে রান্না চাপায়। তাই টুবলোর মা তাড়াতাড়ি হেঁসেলের কাজ চুকিয়ে দিয়ে রওনা হল পাশের বাড়ি। উঠোনটা পেরিয়ে টুবলোর মা একটু থমকে দাঁড়াল। কেমন করে সুর করে তার ছেলে মহাভারত পড়ে একটু দূর থেকে শুনতে যদি একটু সাধ যায় তাহলে কোনও মাকেই দোষ দেওয়া যায় না!

কিন্তু এক্ষেত্রে মাকে হতাশ হতে হল।

কই, টুবলোর গলা তো পাওয়া যাচ্ছে না!

কৌতূহল জাগল মায়ের মনে। টুবলো তো বেশ

চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই পড়তে পারে। আজ আবার তাহলে কী হল!

পা টিপে টিপে মা এগুলেন পিসিমার রান্নাঘরের দিকে। দরজার ফাঁক দিয়ে চোখ পড়তেই তিনি যা দেখলেন তাতে গালে হাত রেখে থ হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায়ই রইল না।

টুবলোর হাতে একটি পাথরের বাটি ধরা। উনুনের চাপানো বোকনা থেকে হাতা কেটে পিসিমা কী যেন সেই বাটিতে ঢেলে দিচ্ছেন আর টুবলো তার থেকে একটি-দুটি করে গালে ফেলে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে গরমের জন্য উঃ—আঃ—ওঃ করছে।

বেশ খানিকক্ষণ মায়ের মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুল না! তারপর হঠাৎ যেন নিজের মধ্যে অনেকখানি শক্তি সঞ্চয় করে চিৎকার করে উঠলেন,— ওরে শয়তান, এই তোর মহাভারত পড়া?

হঠাৎ মায়ের সাড়া পেয়ে টুবলোর হাত থেকে পাথরের বাটিটা মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল। আর মুখে যে তপ্ত তরকারি ছিল, সেটা চট করে গিলে ফেলতে না পেরে শ্রীমান প্রকাণ্ড একটা হাঁ করে সঙের মতো

দাঁড়িয়ে রইল।

এইবার মা পিসিমার দিকে ফিরে বললেন,—তোমাকেও বলি ঠাকুরঝি, এই সেদিন ও এত শক্ত অসুখ থেকে উঠল, আর তুমি কী না ওকে লঙ্কা-বাটা রান্না তরকারি খাওয়াচ্ছ?

পিসিমাও ততক্ষণে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে প্রস্তুত হলেন। জিবে লঙ্কারই মতো খানিকটা ঝাঁজ মিশিয়ে উত্তর দিলেন—দেখো বউ, আমাকে দোষী করবার আগে তোমার ছেলেকে তো সামলাও। মিছিমিছি আমাকে কথা শোনাচ্ছ কেন?

টুবলো এই ফাঁকে তরকারিটা গিলে ফেলেছে। সে আমতা আমতা করে উত্তর দিলে,—না—মা, আমি তো, পিসিমার তরকারি একটু চোখে দেখছিলাম—নুনটা ঠিক হয়েছে কী না!

—হুঁ!

এর বেশি কোনও কথা তখন মায়ের মুখে জোগাল না। তিনি পা টিপে টিপে এসেছিলেন বটে—কিন্তু ফিরলেন একেবারে দুপদাপ শব্দ করে।

পিসিমা আর টুবলো তার চলার দিকে অবাক হয়ে

তাকিয়ে রইল।

খানিক বাদে পিসিমা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন,—এ আমি আগেই জানতাম। বউ আমার কিছুই পছন্দ করে না। নইলে আমি শুধু রান্নার তরকারিই দিয়েছি, হাতে তুলে বিষ তো আর দিইনি!

টুবলোও এরই মধ্যে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছে। ঢোক গিয়ে বললে,—সত্যি পিসিমা, মা-র এ বড্ড বাড়াবাড়ি। তোমায় কেমন রোজ মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছি। তোমারও শোনা হচ্ছে— আর আমারও কেমন জ্ঞান বাড়ছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে যদি তোমার হাতের রান্না একটু চেখে দেখি—তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

পিসিমা দুঃখ করে, কপাল চাপড়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন,—একদিন তোর এই পিসিমার হাতের রান্না খেতে সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ত। তোর পিসেমশাই নিজেও যেমন খেতে পারতেন, পরকে খাইয়েও ছিল তাঁর তেমনি আনন্দ। আর আমি কী রান্নাটা না জানতাম শুনি? পোলাও-মাংস থেকে শুরু করে, পিঠে-পায়েস, সন্দেশ রসগোল্লা......কী নয়! তারপর

আমার কপাল পুড়ল, আর সব কিছু সাধ-আহ্লাদ চিরকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।

টুবলো মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—সে তো সত্যি কথাই পিসিমা! আমি কিন্তু কোনও দিনই তোমায় হেলা-ফেলা করব না। রোজ আসব, মহাভারত পড়ে শোনাব, আর তোমার হাতের রান্না চাখব—

পিসিমার মুখখানি হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত টুবলোর দিকে তাকিয়ে থেকে পিসিমা বললে,—না বাপু, আমার মহাভারত শুনেও কাজ নেই, আর তোমাকে আমার রান্না তরকারিও চাখতে হবে না।

কেন পিসিমা, কেন?—আঁতকে উঠে টুবলো জিগ্যেস করে।

পিসিমা ফোঁস করে উঠে উত্তর দেয়,—কেন? হয়তো কোনও দিন কোনও কারণে তোর অসুখ করবে—আর সমস্ত দোষ পড়বে এই পিসিমার ওপর। ওই যে কথায় বলে, সুখের চাইতে স্বস্তি ভালো। তোর মায়ের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা আমি আর শুনতে চাইনে।

—না পিসিমা, তুমি কিছু মনে করো না, আমি

মাকে সব বুঝিয়ে বলব।

পিসিমা মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—না বাপু, তোমার বুঝিয়ে দরকার নেই, আর আমার বকুনি খেয়েও কাজ নেই।

মুখ চুন করে টুবলো এক-পা দু-পা করে বাড়ি ফিরে এল।

এরপর দু'দিন মনের দুঃখে টুবলো কোথায়ও বেরুল না। চুপচাপ ঘরে বসেই কাটাল। গল্পের বইয়ে মন যায় না, লুডো খেলতে ইচ্ছে করে না, ছবি আঁকতে ভালো লাগে না.....টুবলো অস্থির হয়ে উঠল।

হঠাৎ একদিন সইমার কথা মনে পড়ে গেল। সইমার বাসাটা একটু দূরে। দূরে সে তো ভালো কথা। মা যখন-তখন গিয়ে হাজির হতে পারবে না। কাজেই চাখবার ব্যাপারে এ একটা মস্ত বড় সুবিধে।

পরের দিনই টুবলো গিয়ে হাজির হল দুপুরবেলা। সইমা তখন পুডিং তৈরি করছে।

টুবলোকে আর বেশি ভূমিকা করতে হল না।

সইমা নিজে থেকেই বললে,—এই যে টুবলো এসেছিস। আচ্ছা, কেমন আছিস আজকাল? শরীরটা বেশ সেরেছে তো?

টুবলো আনন্দে আটখানা হয়ে উত্তর দিলে,—শরীর এখন খুব ভালো আছে সইমা! দেখো না, আগের চাইতে কেমন ঝরঝরে হয়েছে শরীরটা। দেখে নিয়ো তুমি, তিন মাসের মধ্যেই একেবারে মোটা হয়ে যাব।

সইমা হাসতে হাসতে উত্তর দিলে,—সেই ভালো রে, সেই ভালো।

তারপর একটু থেমে জিগ্যেস করলে,—আচ্ছা, এই যে পুডিং তৈরি করেছি, তুই একটু চেখে দেখবি নে?

টুবলো যেন হাতে স্বর্গ খুঁজে পেল।

সবগুলি দাঁত একসঙ্গে বের করে ফেলে বললে,—বাঃ তুমি নিজে হাতে তৈরি করেছ, আর আমি একটু চেখে দেখব না? দাও দাও, কী রকম হয়েছে চেখে দেখি—

টুবলোর মুখের দিকে আর একবার তাকিয়ে সইমা

ভয়ে ভয়ে খানিকটা পুডিং কেটে ওর হাতে তুলে দিল।

প্রথমেই সবটা মুখে তুলে দিলে না টুবলো। জিব দিয়ে একটু চেটে দেখলে আগে। জিবের সঙ্গে দুটো কিশমিশ আলতোভাবে উঠে এল। চোখ বুজে স্বাদ গ্রহণ করে টুবলো। মনে মনে ভাবলে,—স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো এখানে।

আবার বুক দুর দুর করতে থাকে—মা যদি আচমকা এসে পড়ে!

চোখ দুটো পটাস করে একবার খুলে ফেললে শ্রীমান। নাহ, মাতাঠাকুরাণির ভয় নেই। আমেজ করে গালে চালিয়ে দিলে পুডিং-এর ফালি। বেশ খানিকক্ষণ জিবটাকে ওলট-পালট ওপর-নীচ করে পুডিং-এর টুকরোটাকে মিলিয়ে দিলে মুখের মধ্যে। তারপর চোখ বন্ধ করে মন্তব্য করলে,—দিব্যি হয়েছে সইমা!

সইমা খুশি হয়ে বললে,—আচ্ছা তুই বস টুবলো, আমি হাতের কাজগুলো শেষ করে আসি। না হয় তুই গল্পের বই পড়—আমার আলমারি থেকে বের করে।

সইমার বাড়িতে এই একটা মস্ত বড় প্রলোভন। রাশি রাশি ছবিওয়ালা গল্পের বই আছে। অনেকগুলো আলমারি ভর্তি। সইমা গয়না গড়াতে ভালোবাসে না। শুধু মজার মজার বই কেনে, আর নিজের হাতে খাবার তৈরি করে সবাইকে চাখতে দেয়।

এই রকম মজাদার বাড়িতে আসা বন্ধ ছিল টুবলোর। এইবার নতুন করে আবার শুরু হল আনাগোনা।

ওর মা পিসির বাড়িতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল। টুবলো বললে,—আমি এখন থেকে সইমার বাড়ি যাব, আর গল্পের বই পড়ব। মা ভাবলে, এ মন্দের ভালো। সেখানে নানারকম বই-পত্তর নিয়ে ভুলে থাকবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটল এক ঘটনা।

সইমা এক প্যান মাংস রান্না করে, বাড়িতে ঢাকা দিয়ে রেখে বেড়াতে গেছে নিজের বোনের বাড়ি। এমন সময় এটা-ওটা চাখবার লোভে টুবলো এসে হাজির হল সেখানে। এঘর-ওঘর ঘোরাঘুরি করে দেখলে সইমা বাড়িতে নেই, শুধু পুরোনো ঝিটা

বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে ঘুমুচ্ছে।

প্রথমে টুবলো আলমারি থেকে একটা বই নিয়ে পড়তে বসল। দু-একটা গল্প পড়বার পরই ঘন ঘন হাই উঠতে লাগল শ্রীমানের।

বইখানি ফেলে রেখে কুকুরের মতো শুঁকতে লাগল—এঘর-ওঘর এখানে-সেখানে। রান্নাঘরের দরজা খুলে দেখলে একটা প্যান ঢাকা দেওয়া আছে। আর সেখান থেকে চমৎকার মাংসের গন্ধ বেরুচ্ছে। ঢাকনা তুলেই একেবারে তাজ্জব বনে গেল টুবলো। যেমন রং...তেমনি গন্ধ!

অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থেকে—সে শুধু মনে মনে বললে, আমি একটু চেখে দেখব বৈ তো নয়।

তারপর শুরু হল সেই চাখা। চামচে দিয়ে এক টুকরো করে বাটিতে তুলে নেয় আর চাকুম-চুকুম করতে করতে আপন মনে মাথা নাড়ে।

সত্যি, সইমার মতো এমন সুন্দর মাংস আর কেউ রান্না করতে পারে না! মা যে কী মাংস রেঁধে রাখে! শুধু আদা আর হলুদের গন্ধ! বিচ্ছিরি। খেতে খেতে

অরুচি ধরে গেছে ওর জিবে। এমন টকটকে না হলে আর মাংস! ক্রমাগত একটার পর একটা টুকরো চিবোয় আর ঝালে হুস-হাস শব্দ করে। ঝাল একটু হয়েছে বটে, তবে স্বাদ কী অপূর্ব!

হঠাৎ টুবলো তাকিয়ে দেখে—অর্ধেক প্যান একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

সর্বনাশ!

ঘটি থেকে জল ঢেলে প্যানটাকে পুরো করে রাখবে? উঁহুঁ! তাহলে তো স্বাদ বদলে যাবে। সইমা এসে ঠিক ধরে ফেলবে। তার চাইতে প্যান খোলাই পড়ে থাক। সবাই মনে করবে বেড়ালে খেয়ে গেছে মাংস।

পা টিপে টিপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল টুবলো। চুরি করে খাওয়াটাকে গোপন করা গেল বটে, কিন্তু পেটটাই টুবলোর সঙ্গে একেবারে বিশ্বাসঘাতকতা করলে।

সেদিন রাতে টুবলোর পেট ফুলে একেবারে জয়ঢাক। তারপর আনো ডাক্তার, আনো কবরেজ—বমি...বাহ্যি... বরফ...বোতল ওষুধ আর ইনজেকশন।

সেই সঙ্গে টুবলোর চিৎকার—আর আমি মাংস চাখব না সইমা! পেটের ব্যথায় মারা গেলুম, আমায় বাঁচাও!

বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে হিমসিম! হাসবে, না কাঁদবে ঠিক ঠাহর করতে পারে না!

৩ আমি আগেই জানতুম

জোর ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে স্কুলের খেলার মাঠে। হরিহাট হাই স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে পাশের গ্রামের 'উচ্চিংড়ে সমিতি'র সভ্যদের ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা!

সেই খেলা দেখতে আশপাশের দশটা গাঁয়ের ছেলে-ছোকরারা এসে জুটেছে।

মাঠের চারদিকে আর তিল ধারণের ঠাঁই নেই।

হাটুরেরা সওদা নামিয়ে রেখে দাঁড়িয়ে গেছে। যেসব লোক ঘোড়ার পিঠে করে মাল-পত্তর নিয়ে দূর গাঁয়ে যাচ্ছিল—তারা ঘোড়া খুলে দিয়ে এক মনে খেলা দেখছে। হাঁড়ি-কলসি নিয়ে কুমোর যাচ্ছিল বিক্রি করতে হাটের দিকে—সেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে মাঠের এক কোণে। ফসল নিয়ে চাষি যাচ্ছিল ঘরে—সেও হা করে খেলা দেখতে শুরু করেছে।

এমনকী পাড়ার যেসব বউ-ঝি পুকুর থেকে কলসিতে জল নিয়ে ঘরে ফিরছিল—তারাও ঘোমটার আড়ালে

ছেলেদের কেরামতি দেখে অবাক বনে গিয়েছিল! একজন সইয়ের গা টিপে দিয়ে ফিস ফিস করে বলছিল,—হ্যাঁলো বিন্দি, চামড়ার বলটাকে নিয়ে সবাই মিলে এত মাতামাতি করছে কেন? ওর ভেতর বুঝি সোনাদানা কিছু লুকোনো আছে?

ফুটবল খেলার নিয়ম-কানুন হয়তো কেউ-ই জানে না, কিন্তু ছেলেদের এই মাতামাতি দেখেই সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

পাড়ার বিষ্টু জ্যাঠা অভিজ্ঞ মানুষ। বললেন,—শেষ পর্যন্ত বল ছেড়ে মাথা ফাটাফাটি হয়ে যাবে। রোস না একটু।

কিন্তু যে লোকটা মাঝে মাঝে বাঁশি বাজিয়ে খেলা থামিয়ে দিচ্ছিল—তার যে অসীম ক্ষমতা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র ছিল না। মাথা ফাটাফাটি যদি হয়—তবে শেষ পর্যন্ত এই লোকটাই ঠেকাতে পারবে। সকলের এই ভরসাই ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটনা ঘটল অন্য রকম। রেফারি হরিহাট হাই স্কুলের একটা ফাউল ধরতে বিরুদ্ধ পক্ষের পেনালটি কিকে ওরা গোল খেয়ে গেল।

ওদের স্কুলের সামনেই খেলা চলছে। কাজেই ছেলেরা এ অপমান সহ্য করবে কেন? মারমুখো হয়ে মাঠে নেমে পড়ল সবাই। তারপর যার বাঁশির শব্দে খেলা চলছিল তাকে সবাই এমন বেধড়ক প্রহার দিলে যে, লোকের কাঁধে চেপে তাকে বাড়ি ফিরতে হল।

হুদো সবাইকার সঙ্গে এতক্ষণ ধরে নির্বাক বিস্ময়ে খেলা উপভোগ করছিল। এইবার এগিয়ে এসে ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মতো হাত নেড়ে বললে,—ও আমি আগেই জানতুম।

এই স্বভাব হুদোর।

প্রথমে মুখে বাক্যি নেই। চুপচাপ সাক্ষীগোপাল হয়ে বসে থাকে। তারপর সব কিছু হাঙ্গামা-হুজ্জতের পর নাটক যখন পঞ্চম অঙ্কে পৌঁছয়—আর সকল কৌতূহলের অবসান ঘটে—ঠিক সেই সময় হুদো মাঝখানে দাঁড়িয়ে আচমকা একটি বোমা ফেলে দেয়—ও আমি আগেই জানতুম।

দলের ছেলেদের কোনও একটা ব্যাপারে মাতিয়ে তুলতে হুদো ওস্তাদ।

এবার পুজোর ছুটিতে কী নাটকের অভিনয় হবে—সেইটে নিয়ে ছেলে মহলে আলোচনা চলছিল। এমন সময় হুদো হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। কিন্তু তার চোখে-মুখে কৌতুক।

সবাই জিগ্যেস করলে,—হ্যাঁরে হুদো, একেবারে ঘোড়ায় চড়ে এলি নাকি? ব্যাপারটা খুলেই বল না!

হুদো উত্তর দিলে,—একটা ভারি মজার কাণ্ড হবে। আমাদের গাঁয়ের তকতা তালুকদারের ব্যাপারটা জানিস তো?

ওই নামটা শুনেই সবাই এক সঙ্গে হই হই করে উঠল।—মুখে ওই নামটা উচ্চারণ করলি তো? আজ আর কারও কপালে অন্ন জুটবে না!

—দূর বোকা, শুধু অন্ন নয়, পরামান্নও যাতে জোটে সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।

হাসতে হাসতে উত্তর দিলে হুদো।

এইবার মারমুখী হয়ে ওঠে ছেলের দল।

—হুঁ! পরমান্ন খাওয়াবে! তেমনি দিল্ কি না তকতা তালুকদারের! বাড়ির দোরগোড়ায় একটি ভিখিরি পর্যন্ত যেতে সাহস করে না!

হাসতে হাসতে ঠিক একই রকম ভাবে মন্তব্য করলে মধু।

হুদো বললে,—আগে আমার প্ল্যানটা মন দিয়ে শোন, তারপর নিজেদের মত জানাবার পক্ষে কোনও অসুবিধেই হবে না।

ভণিতা রেখে বল না কী সে প্ল্যান—ছেলের দল হুমকি দিলে হুদোকে।

তখন গুছিয়ে বসে ডান পা-টা নাচাতে নাচাতে হুদো শুরু করে—

কুমোর পাড়ায় দেখে এলাম, শ্রাবণ সংক্রান্তির জন্যে মা মনসার মূর্তি তৈরি হচ্ছে। রাত্তিরের অন্ধকারে একখানি মূর্তি সরিয়ে এনে যদি তকতা তালুকদারের বাড়ির দোরগোড়ায় রেখে দেওয়া যায়......তাহলে ঘুম থেকে উঠেই বাছাধন এই মূর্তি সদর দরজার সামনেই পাবে—

তাহলে কী সুবিধেটা হবে শুনি?—গজা চোখ দুটো বড় বড় করে প্রশ্ন করে।

হুদো উত্তর দিলে,—বারে? সুবিধে হবে না? মা মনসার বাহন কে বল দেখি?

মধু বললে,—কেন সাপ!

হুদো এইবার দুটো পা-ই নাচাতে নাচাতে ফোড়ন কাটলে,— তাহলে? সাপকে ভয় না করে কে, শুনি? ওই সাপের আতঙ্কেই তকতা তালুকদার মা মনসার পুজো করতে পথ পাবে না। তারপর পুজো যদি একবার শুরু হয়—বাড়িতে যদি শঙ্খ-ঘন্টা বাজে, তাহলে আমাদের নেমন্তন্ন আটকায় কে?

এইবার হুদোর প্ল্যানে ছেলের দল একটা নতুন আমোদের আমেজ খুঁজে পেল।

শামুক বললে,—তাহলে দেরি করে লাভ কী? আজ রাত্তিরেই কি বলিস?

মধু বললে,—ঠিক! ঠিক!

গজা বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বহুকাল আশ মিটিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়া হয়নি। হুদো এ বুদ্ধিটা মন্দ বের করিসনি। আমরা সবাই মিলে আজ বেশি রাত্তিরে গিয়ে মনসার মূর্তি মাথায় করে নিয়ে আসব।

মধু বললে,—উঁহু! দল বেঁধে গেলে এ সব কাজ পণ্ড হয়। মাত্র দুজন গিয়ে রাত্তিরের অন্ধকারে কাজ হাসিল করতে হবে।

শামুক মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললে,—ঠিক! ঠিক!

শেষ পর্যন্ত লটারি করে ঠিক হল—মধু আর হুদো একটু বেশি রাত্তিরে কুমোর পাড়ায় গিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে আসবে।

ছেলেরা মিশকালো আঁধার রাতে কী করে এল—ঘুমন্ত গাঁয়ের লোক তার কোনও কিছুই জানতে পারল না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে তকতা তালুকদার দুর্গানাম স্মরণ করে সদর দরজা খুলেই একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

কী মুশকিল!

এই মা মনসার মূর্তি একেবারে তারই বাড়ির দোরগোড়ায়। দেখে যে চোখ বুজে পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন—তার জো নেই! সাপের রানি মা মনসা একেবারে কাঁচা-খেকো দেবতা। তাঁকে পুজো না দিয়ে চাঁদসদাগর কী ভাবে পরপর সাত পুত্রকে হারিয়েছিল—সে কাহিনি পল্লী অঞ্চলের ছেলে-বুড়ো সবাইকার জানা।

অত কাণ্ডের পরও কি মা মনসার প্রতিমা দেখে চোখ বুজে পাশ কাটানো চলে?

তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর গিন্নিকে ডেকে বললেন,—দেখো গিন্নি, পাড়ার লোকের কাণ্ড দেখ! আমার টাকা দেখে ওদের বুঝি চোখ টাটায়!

তালুকদারের গিন্নি দোরগোড়ায় এসে একেবারে সামনে মা মনসার মূর্তি দেখে সটান মাটিতে শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। বললেন, —মা যখন নিজে থেকে আমাদের দরজায় এসেছেন তখন পুজোর আয়োজন করতেই হবে।

এই বলে তিনি প্রতিমাটিকে কোলে তুলে নিলেন।

তকতা তালুকদার এইবার ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন। মনসা পুজো? সে যে অনেক ঝামেলা। আবার পাড়ার যাত্রাদল মনসা পুজোর ভাসান-যাত্রা না গাইতে চায়। টাকা-পয়সা একেবারে নয়-ছয় হয়ে যাবে।

তাই তিনি হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে বললেন—মায়ের আর খেয়ে দেখে কাজ নেই, নিজে থেকে আমাদের দরজায় হেঁটে এসেছেন! এ তোমায় আমি বলে দিচ্ছি গিন্নি, নিশ্চয়ই পাড়ার বখাটে ছেলেদের কাণ্ড!

গিন্নি প্রতিমাটিকে সযত্নে জড়িয়ে ধরে বললেন,—অমন কথা মুখেও এনো না তুমি! ঠাকুর-দেবতা কত ভাবে এসে ভক্তের কাছে পুজো নেন—কেউ বলতে পারে? তুমি মনে আর কিন্তু না রেখে তাড়াতাড়ি পুজোর আয়োজন করো। আসছে শ্রাবণ সংক্রান্তিতেই তো মা মনসার পুজো!

তকতা তালুকদার তালুতে একটা শব্দ করে মন্তব্য করলেন,—তুমি তো বলেই খালাস। পুজোর গন্ধ পেয়ে গাঁয়ের লোকেরা আমাকে মাছির মতো ছেকে ধরবে। আমি কাকে বাদ দিয়ে কাকে বলব? তার ওপর আবার রয়েছে পাড়ার ভাসান-যাত্রার দল। একবার কাকের মুখে খবর পেলে হয়। আমায় সবাই মিলে খুবলে খাবে।

তালুকদার-গিন্নি স্বামীর আর কোনও কথা না শুনে মূর্তিটিকে আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

বাধা দিতে গেলে যে সাহসের দরকার তালুকদারের তা নেই। তার ওপর কোন প্রাণে পুজোর বিঘ্ন সৃষ্টি করতে যাবেন? অমনি চাঁদসদাগরের সাত ছেলের কথা মনে পড়ে।

অন্দর মহলে ঢুকেই তালুকদার-গিন্নি প্রতিমাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে শাঁখ বাজিয়ে দিলেন।

আশপাশে ছেলের দল ওত পেতে ছিল। তাদের চোখগুলি দুষ্টুমিতে জ্বল জ্বল করতে লাগল। হুদো ফিস ফিস করে বললে,—কেল্লা ফতে!

ওরা আর ওখানে থাকা নিরাপদ বলে মনে করলে না। আস্তে আস্তে যে-যার বাড়ির দিকে পা টিপে টিপে প্রস্থান করলে।

একটু বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা গাঁয়ের লোক জেনে গেল যে, তকতা তালুকদার ধুম করে মা মনসার পুজো করছে।

তালুকদার প্রথমে যে ভয় করেছিল শেষ পর্যন্ত সেই সব ব্যাপারই ঘটতে লাগল।

প্রথমেই ঢাকি-ঢুলি-কাঁসি-বাঁশির দল এসে আবদার জানালে পুজোতে তারা বাদ্যি বাজাবে। পাড়ার ছেলের দল মালকোঁচা মেরে এগিয়ে এসে বললে,—আমরা সবাই খাটা-খাটনি করে পুজো নির্বাহ করে দেব। কোনও ভাবনা নেই আপনার।

পাড়ার গিন্নিবান্নীরা জানালেন, যজ্ঞি-বাড়ির প্রসাদ

রান্নার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করবেন।

গাঁয়ের ভাসান-যাত্রার দলও ততক্ষণে তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা একদিন দল বেঁধে এসে বললে,—কর্তা, আপনি মা মনসার পুজো করছেন, আর আমরা গাঁয়েরই মানুষ হয়ে একরাত মা মনসার পালা গাইতে পারব না? আপনার বেশি খরচ হবে না কর্তা। দলের মানুষগুলোকে একবেলা পেট পুরে খাইয়ে দেবেন; আর অধিকারীর হাতে আপনি খুশি হয়ে যা তুলে দেন।

ওরা একেবারে নাছোড়বান্দা! কাজেই সবাইকে মেরে তাড়ালেও বাড়ি ছেড়ে যাবে বলে মনে হল না।

তাহলে যাত্রাও হবে!

এমনিতেই তো পাড়ার ছেলেদের ওপর হাড়ে-চটা ছিলেন তকতা তালুকদার, এখন থেকে গিন্নির ওপর চটে গিয়ে দারুণ ভাবে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করতে লাগলেন।

কোথাও কিছু নেই, মিছিমিছি এক প্রতিমা এনে, বাড়ির দোরগোড়ায় রেখে....এমনি ভাবে জলের মতো টাকা খরচ করালো। তকতা তালুকদার সারাদিনে না পায় স্বস্তি, আর রাত্তিরে না পারে ঘুমোতে!

তারপর আবার এক বিপদ! শুধু পুজো সাঙ্গ করলেই হবে না, গ্রামসুদ্ধ লোককে পাতা পেতে খাওয়াতে হবে। আর মানুষগুলোও হয়েছে তেমনি হ্যাংলা। গায়ে পড়ে এসে নেমন্তন্ন আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে।

—ওহে তালুকদার, এত ঘটা করে মায়ের পুজো দিচ্ছ, আর আমরা একটু প্রসাদ পাব না?

এমন করে বললে আর কী করে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায়? তার ফলে হল কী—গোটা গাঁয়ের আণ্ডা-বাচ্চা, বুড়ো-ধাড়ি সবাইকে বলতে হল।

কিন্তু এতগুলি লোক তারই উঠোনে বসে গোগ্রাসে গিলবে—এ কি তকতা তালুকদার নিজের চোখের ওপর সহ্য করতে পারবে? গুম হয়ে চুপচাপ বসে রইল তালুকদার।

কিন্তু তালুকদার-গিন্নি ভারি খুশি। জীবনে কখনও পুজো-পার্বণ-ব্রত ইত্যাদি করতে পারেননি! ভাগ্যিস ছেলেরা দুষ্টুমি করে মা মনসার প্রতিমা বাড়ির সামনে রেখে গিয়েছিল—তাই এই উপলক্ষে দশজনের পায়ের ধুলো পড়বে উঠোনে। নইলে যে কঞ্জুষ মানুষ, ঘুম থেকে উঠে কেউ নাম নিতে চায় না ওঁর স্বামীর।

তালুকদার-গিন্নি ছুটোছুটি করে পুজোর কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। উঠোন দিয়ে আনাগোনার মুখে এক-একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকান আর আপন মনে মুচকি হাসেন।

এমন দিনে আবার কাক-পাখির মুখে খবর পেয়ে এসে হাজির হল—তকতার গুণধর ভাগ্নে শুক্তো।

শুক্তো বললে,—মামা, এমন যজ্ঞি ব্যাপার শুরু করে দিয়েছ, কিন্তু তোমার মুখে হাসি নেই কেন?

তকতা মুখ গোমরা করে উত্তর দিলেন,—নিজে এসেছিস—বেশ ভালো কথা। আবার একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস কী করতে? ওটাও কী আমার কুটুম নাকি? পাদ্য অর্ঘ দিয়ে বরণ করে নিতে হবে ওকে?

শুক্তো তাড়াতাড়ি জিভ কেটে উত্তর দিলে,—উঁ-হুঁ-হু! অমন কথা মুখেও এনো না মামা! ওকে কুকুর বললে অপমান করা হয়। ওর নাম কী জানো? 'জিঘাংসা!' পৃথিবীতে এমন কাজ নেই যা ও না পারে। কত রকম ফ্যাসাদ থেকে ও যে আমায় বাঁচিয়েছে সে কথা জানাতে গেলে একটা মোটা বই লেখা হয়ে যাবে।

ওকে তুমি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করো না মামা!

মামা বললেন,—আমাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে পারবে তোর ওই হ্যাংলা কুকুর?

ভাগনে জিগ্যেস করলে,—আগে তোমার বিপদের বার্তাটা জানাও, তারপর আমি বলব, জিঘাংসা তোমায় বাঁচাতে পারবে কি না!

মামা যেন অকূল সমুদ্রে একটা খড়-কুটো খুঁজে পেলেন। ভাগনের হাতখানা জড়িয়ে ধরে আকুল আগ্রহে আবেদন জানালেন,—আয়, আমার সঙ্গে ঘরে আয়। তোকে সব কথা খুলে বলছি।

মামা-ভাগনের গুজ গুজ ফুস ফুস অনেকক্ষণ ধরে চলল। সব শুনে ভাগনে তিনটে তুড়ি মেরে বললে,—ও! এই ব্যাপার! তুমি গ্রামের লোকদের খাওয়াতে অনিচ্ছুক? বেশ তো! খাওয়াতে হবে না তোমাকে। কিন্তু নেমন্তন্ন করতে তো কোনও বাধা নেই। ফলাও করে নেমন্তন্ন করো মামা। তারপর আমার খেলটা দেখে নাও। কথায় বলে, ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে।

ভয়ে ভয়ে মামা শুধোলেন,—কিন্তু সবাই যদি এসে পাতা পেড়ে বসে পড়ে, তখন উপায়?

ভাগনে বললে,—বেশ তো! কিছু কলাপাতা, নুন আর মাটির গেলাস নষ্ট হবে। এর বেশি তো আর কিছু নয়। রান্নাবান্না কিচ্ছু তোমায় করতে হবে না মামা। তোমায় আমি খরচের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেব।

তকতা তালুকদার তখনও গাঁই-গুঁই করতে থাকেন। শুক্তো তাকে অভয় দিয়ে বলে,—আমি যখন এসে পড়েছি তখন তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন মামা? গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেরা তোমায় জব্দ করবার জন্যে বাড়ির সামনে প্রতিমা এনে রেখেছে। উদ্দেশ্য তোমায় দিয়ে পুজো করিয়ে ওরা করবে পেট পুজো। তুমিও এমন কায়দা করবে যে বাছাধনরা টের পেয়ে যাবে তুমি কী চিজ। গ্রাম ঝেঁটিয়ে নেমন্তন্ন করো মামা। কাউকে বাদ দিও না। কিন্তু বলে দিচ্ছি তোমায়,—তোমার এই গুণধর ভাগনে থাকতে কাউকে খাওয়াতে হবে না। পৃথিবীতে বুনো ওল গজায় সত্যি, কিন্তু বাঘা তেঁতুলেরও তো অভাব নেই।

ভাগনের কথা শুনে এইবার মামার মুখে হাসি ফুটল। গুন গুন গান করে আর তুড়ি দিয়ে মামা সারা উঠোন চষে ফেলতে লাগলেন।

তালুকদার-গিন্নি স্বামীর হঠাৎ পরিবর্তন দেখে তো অবাক! পুজোর দিন রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন।

গ্রামসুদ্ধ মানুষ মহা পুলকিত। প্রচুর আয়োজন করেছে নাকি তকতা তালুকদার।

ভাগনে আরও বাড়ি ঘুরে মামার আয়োজনের কথাটা সাত কাহন করে ছড়িয়ে দিয়েছে।

তকতা তালুকদারের প্রকাণ্ড উঠোন। সেই উঠোন জুড়ে টাঙানো হয়েছে প্রকাণ্ড এক সামিয়ানা। সেই সামিয়ানা দেখলেই সকলের ক্ষিদে আরও বেড়ে যায়।

যাই হোক, ভাগনের বুদ্ধি মতো কয়েকটি গ্যাস লাইট জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে উঠোনের চার কোণে। সারি সারি কলার পাতা পড়ে গেছে সারা উঠোনময়। সঙ্গে সঙ্গে কুশাসন। বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে পরিবেশনকারীরা চারদিকে দাঁড়িয়ে গেছে। এসব শুক্কোর পরিকল্পনা। দেখাতে হবে,—অনেক আয়োজন করা হয়েছে গ্রামসুদ্ধ লোকের জন্যে।

হাসি মুখে কুশাসন অধিকার করেছে—আণ্ডা-বাচ্চা গুঁড়ো-গাড়া বুড়ো-হাবড়া সবাই। ভুঁড়ো পেট নিয়ে পণ্ডিত মশাইরা বসেছেন। কুশাসনের ওপর তাদের

জায়গা কুলোচ্ছে না, তাই অনেকে আমেজ করে ভোজন করবেন বলে দুটো করে আসন চেয়ে নিয়ে পারিপাটি করে বসেছেন।

শুক্তো হাঁক-ডাক করে বললে,—সবাইকার পাতে লেবু পরিবেশন করে দাও—এক্ষুনি গরম গরম পোলাও আসছে।

ছেলের দল উঠোনের এক পাশে বেশ আসর গুলজার করে বসেছিল।

হুদো শামুককে একটা ঠ্যালা দিয়ে বললে,—কী রকম শুনছিস? পোলাও আসছে। ভাগ্যিস আমি তালুকদারের বাড়ির সামনে প্রতিমা রাখার প্ল্যান দিয়েছিলাম।

মধু বললে,—ঠিক বলেছিস! নইলে কি আর এমন গরম পোলাও কারও কপালে জুটত!

সবাইকে লুকিয়ে এক চোট হেসে নেয় ছেলের দল। হুদো বলে,—নুন দিয়ে এক টুকরো করে লেবু চুষে খেয়ে নে। তাহলে বেশ পোলাও টানতে পারবি—

সবাই নীরবে মাথা নেড়ে সায় দেয় আর লেবু চুষতে শুরু করে।

শুক্তো এই পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। সে

সুট করে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। ওর বড় পেয়ারের 'জিঘাংসা' কুকুর। আজ আবার ইচ্ছে করেই সারাদিন না খাইয়ে রেখেছে। করল কী, হঠাৎ শিকলটা খুলে উঠোনে-বসা লোকদের দেখিয়ে দিলে—

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা একেবারে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ল উঠোনে। তার ওই প্রাণ কাঁপানো চিৎকার আর লম্ফঝম্প দেখে পড়ি কী মরি করে সবাই প্রাণের দায়ে ছুটে পালাতে লাগল। মাটির গেলাস উলটে পড়ে জলে একাকার হয়ে গেল উঠোন; তাতে কত লোক আছাড় খেয়ে পা ভাঙল; কলাপাতাগুলো উড়ে লন্ডভন্ড হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। জামা-কাপড় কাদায় একাকার। কয়েকজন কুকুরের আঁচড়-কামড়েও আর্তকণ্ঠে চিৎকার করতে করতে মুক্ত কণ্ঠে ছুটতে লাগল।

হুদো-মধু-শামুকের দলও নাকালের একশেষ আর আধমরা হয়ে গ্রামের শেষ প্রান্তের বটগাছ তলায় হাজির হল। মধুর হাঁটুতে আবার কুকুর আঁচড়ে কামড়ে দিয়েছে। সে চিৎকার করে বললে,—কোথায় গরম পোলাও মুখে তুলবে—তা নয় কী না কুকুরের কামড়!

শামুক ফোড়ন কাটলে—কোথায় রাম রাজা হবে—

না একেবারে তার বনবাস!

হুদো অবশেষে একটা হাই তুলে তুড়ি মেরে মন্তব্য করলে,—ও আমি আগেই জানতুম!

হুদোর ওপর হাড়ে হাড়ে চটে গেছে তার বন্ধুর দল। সে এক-এক সময় একটা হুজুক তুলবে, কেউ রাজি না হলে ছলে-বলে-কৌশলে তাকে নাচিয়ে তুলবে,—অবশেষে যদি সমস্ত ব্যাপারটাই গোল হরিবোল হয়ে যায়—তখন সে অসীম আলস্যে হাই তুলে রায় দেবে,—ও আমি আগেই জানতুম।

হুদো যেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। ফোড়ন কাটার সময়—ও আমি আগেই জানতুম!

শামুক বললে,—হুদো আজ উপস্থিত নেই, এই ফাঁকে কাজের কথাটা বলেনি।

মধু শুধোল,—কী কাজের কথা, শুনি?

শামুক উত্তর দিলে,—শোন, এইবার একটা হুজুক তুলব আমি। তোরা সবাই আমাকে সামর্থন করে যাবি। তারপর আর সব ভার আমার।

সবাই সমর্থন করে বললে,—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমরা

শুধু বালি-সুগ্রীবের যুদ্ধ দেখতে চাই, আর কিছু বাসনা নেই।

এই ঘটনার দিন দুই বাদে সবাই এসে সেই নিরালা বটগাছতলায় বসেছে। শামুক বললে,—পাশের গাঁয়ে আমার মাসির বাড়ি। সেই বাড়ির পেছন দিয়ে একটা এদো পুকুর আছে। মজার কথা হচ্ছে এই যে, সেই ডোবা ভর্তি শুধু বড় বড় কৈ আর মাগুর। বড়শি ফেলবার যেটুকু দেরি! সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে—

হুদো একেবারে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

—কৈ মাছ? তাতে আবার বড় কৈ? এ যে আমার সবচাইতে প্রিয় জিনিস! তা কবে তোর মাসির বাড়ি যাচ্ছি আমরা?

কিন্তু শামুক যে একেবারে শম্বুক গতিতে চলছে। ওর ভেতর বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখা গেল না। শুধু বললে,—সবাই রাজি হলে তো?

কিন্তু হুদো ছাড়বার পাত্র নয়।

হাঁক-ডাক করে বন্ধুদের মাতিয়ে তুললে। বললে,—সেদিন গরম পোলাও হাত থেকে ফসকে গেছে। এবার

আমরা খাব ভূনী খিচুড়ি আর তেল-কৈ।

হুদোর অতি উৎসাহ সবাইকে শেষ পর্যন্ত রাজি হতেই হল। জোগাড় করা হল নানাবিধ ছিপ। ছোট, বড় মাঝারি। আর সেই সঙ্গে মাছ ধরবার মসলা-দেওয়া রকমারি চার।

শামুক আগে থেকেই তার মাসির বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিলে। কৈ মাছ না হয় ছিপে ধরা পড়বে, কিন্তু ভূনী খিচুড়ির ব্যবস্থা তো রাখতে হবে। নইলে শেষ মুহূর্তে আঁকুপাঁকু করলে কী হবে?

অবশেষে—'শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাড়ি।'

নদীপথেই ওদের যাওয়া সুবিধে। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বন্ধুর দল মাসির বাড়ি গিয়ে হাজির হল।

বাড়ি দেখে সবাইকার আর আনন্দ ধরে না! একেবারে চকমেলনো তিন-মহলা বাড়ি। বাইরের সঙ্গে অন্দর মহলের কোনও সম্পর্ক নেই। যেন আর এক রাজ্যিতে এসে হাজির হওয়া গেল।

কিন্তু সেই ডোবা দেখে সবাইকার ভক্তি একেবারে চটকে গেল। কিন্তু হুদোর অদম্য উৎসাহ।

বড় বড় তেলওয়ালা কৈ! ওঃ—তাকে খেতেই হবে।

বন্ধুর দল এক জোট হয়ে ছিপ বাগিয়ে, চার নিয়ে, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র গুছিয়ে সেই ডোবার ধারে গিয়ে হাজির হল।

হুদোর আর এক মুহূর্ত দেরি সয় না।

শামুকের মেসোমশাই চাকরকে ডেকে বললেন,—ছেলেদের বসবার জন্যে একটি করে কাঠের জলচৌকি নিয়ে আসতে।

কিন্তু তার মধ্যে কত কৈ মাছ ছিপে আটকে ফেলা যাবে। হুদো আর এক মুহূর্তও নষ্ট করতে রাজি নয়। যেমন ছিপ নিয়ে তড়িৎ গতিতে ডোবার কিনারে এগিয়ে গেছে অমনি একেবারে পা পিছলে আলুর দম।

চিৎকার করে উঠলেন শামুকের মেসোমশাই।

—আরে কে কোথায় আছিস—ধর ধর—ছেলেটা ডোবার জলে পড়ে গেল যে!

বন্ধুর দল অবশ্য খানিকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু একবারে ডোবার কিনার অবধি নয়। প্রাণের ভয় সবাইকারই আছে।

জমিদারবাবুর আদেশে একটি চাকর অনেক কষ্টে হাত বাড়িয়ে হুদোর বড় বড় চুলের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরলে।

তখন হুদো এক চুবন খেয়ে কিম্ভুতকিমাকার মূর্তিতে সবে মাথা তুলেছে। তার সারা মুখ পচা কাদা, গোবর আর গুগলি-শামুক-জোঁকে ভর্তি।

হুদো না পারছে চোখ চাইতে, আর না পারছে কোনও কথা কইতে। শুধু চোখ দুটো ঠেলে উঠেছে একেবারে কপালের দিকে।

এইবার শামুক একটু এগিয়ে এসে বাঁকা চোখে হুদোর দিকে তাকিয়ে রায় দিলে—ও আমি আগেই জানতুম!

নেমন্তন্ন নাও বাগিয়ে

গোটা পাড়ার ছেলের দল পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখছিল লরি, ঠেলা আর গাড়ির ভেতর থেকে একে একে কত বিচিত্র জিনিস বেরুচ্ছে!

ব্যাপার আর কিছুই নয়, পাড়ার যে বিরাট বাড়িটা এতদিন হানাবাড়ি বলে পরিচিত ছিল—তাতে আজ নতুন ভাড়াটে এল।

প্রথমে এল সার দিয়ে ঠেলা গাড়ি, তারপর লরির মেলা, অবশেষে নানা রঙের মোটরে বাড়ির আসল লোকেরা। কেউ রোগা, কেউ ঢ্যাঙা, কেউ মোটা, কেউ বেঁটে। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। মেয়েদের মধ্যেও তাই। পাকা চুল দিদিমা-ঠাকুমারাও আছেন, সুন্দরী গিন্নিবান্নীরাও রয়েছেন, আবার আধুনিকা বউ-ঝিদেরও অভাব নেই।

কিন্তু ওরা যাদের কামনা করছিল—তাদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না।

ব্যাপারটা খুলেই বলি। পাড়ার ছেলের দল খুব আশা

করেছিল যে, ওদের বয়েসি দু-একটি ছেলে এই পরিবারে নিশ্চয়ই থাকবে। একজনও যদি ওদের খেলার সঙ্গী মেলে তাহলে এ বাড়িতে ঢোকবার পথটা পরিষ্কার হবে। এতবড় বাড়ি যারা ভাড়া নিতে পারে—তারা বড়লোক নিশ্চয়ই। নেমন্তন্ন কী আর দু-একটা জুটবে না এ বাড়িতে?

প্রথমে ওরা আমোদ পেয়েছিল এই ভেবে যে, আসুক না বাছাধনরা। হানাবাড়ি এটা! দুদিন থেকেই পালাতে পথ পাবে না। একটি পেতনি নাকি আশ্রয় নিয়েছে এই বাড়ির চিলে কোঠায়!

কিন্তু যখন ভূতুড়ে বাড়ির নতুন ভাড়াটেরা সত্যি এসে উপস্থিত হল—তখন পাড়ার ছেলেদের মুখ একেবারে হা হয়ে গেল! এত জিনিসপত্তর—এত চাকর-বাকর ঝি-দারোয়ান—এত মানুষ একটা পরিবারে। সত্যি তাকিয়ে দেখবার মতো। যে ঠাকুর এদের জন্যে দু-বেলা রান্না করে তাকে একটা বিশেষ পুরস্কার দেওয়া প্রয়োজন।

এইরকম একটা মন্তব্য করলে পাড়ার বিচ্ছু ছেলে চাকু। চাকুর মতোই ধারাল চকচকে কথাবার্তা। চেহারাটাও পাতলা চাকুর ধারদেয়া ফলার মতো।

টিপু বললে,—আমার কী মনে হচ্ছে জানিস? এইবার বাড়িটার ভূতুড়ে নাম ঘুচল।

ছেলেরা এই মুখোরোচক খবরে বিশেষ উৎসাহ বোধ করল। তাই সবাই সমস্বরে প্রশ্ন করলে,—কেন বল দেখি? এ কথা তোর কী করে মনে হল?

টিপু একবার চারদিকে তাকিয়ে উত্তর দিলে,—ব্যাপারটা কী জানিস? এই বাড়ির চিলে কুঠুরিতে থাকে এক পেতনি। কেউ তাকে কখনও চোখে দেখেনি। অনেকের অনুমান। কিন্তু এ বাড়িতে যেসব লোকজন এসে জড় হল—তারা তো আর অনুমান নয়। দিব্যি চোখে দেখা যাচ্ছে। ওই একা টিং টিংএ অদেখা পেতনি—এই অ্যা-ত্তোগুলো জাঁদরেল জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে পারবে কেন?

চাকু লাফিয়ে উঠে উত্তর দিলে,—ঠিক বলেছিস তুই। এইবার পেতনিটা বাস্তুহারা হল। ওর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

টিপু মুচকি হেসে ফোড়ন কাটলে,—কেন, তোর ঘাড়টাকে তো আর ভাড়া দিসনি। সেইখানে এসেই পেতনিটা আশ্রয় নিক না।

—ওরে বাব্বা! আমার কাঁধে পেতনি! হুঁ ব্বাবা।

আমিও ঝকঝকে ধারাল চাকু। ওর ঠ্যাং দেব কুপিয়ে কেটে।

এই রকম চোখা-চোখা কথা শুনে ছেলের দল এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

বল্টু এতক্ষণ চুপ করে টিপু আর চাকুর রসিকতা উপভোগ করছিল। এখন সুযোগ বুঝে একটু এগিয়ে এসে মন্তব্য করলে,—ওরা বোধ করি খুব বেশি দিন এ বাড়িতে থাকবে না।

—কেন? কেন? কেন?

চারদিক থেকে ছেলেদের দলের প্রশ্ন উঠল।

বল্টু বললে,—আমার মনে হয় মেয়ের বিয়ে দিতে ওরা এই হানাবাড়ি ভাড়া নিয়েছে। প্রচুর ঘর, জায়গার অভাব নেই। যার যেখানে খুশি শুয়ে পড়ো। নইলে এই পোড়ো বাড়ি সুখ করে আর কে ভাড়া নিয়ে বসবাস করতে চায়?

চাকু মাথা নেড়ে উত্তর দিলে,—কথাটা হয়তো তুই মিথ্যে বলিসনি। ওই যে ফুটফুটে দিদিমণিটি একটা শান্তিনিকেতনী কাজ-করা ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ আগে গট গট করে ওপরে উঠে গেল—নিশ্চয়ই কলেজে পড়ে। ওরই বিয়ে হয়তো ঠিক হয়েছে।

—ঠিক! ঠিক!

ছেলেদের মুখের খৈ ফুটতে লাগল—

—বাড়িটার আগাগোড়া চুনকাম করা হবে

—নতুন রং লাগানো হবে দরজা-জানালায়

—ছাদে ম্যারাপ বাঁধা হবে

—বাড়ির সামনের রাস্তাটা ঘেরাও করে চেয়ার বসবে

—সানাই বসবে দোতলার ঝুল-বারান্দায়

—বর আসবে ব্যাগপাইপ বাজিয়ে

—কিন্তু কেউ আমাদের নিমন্তন্ন করতে আসবে না!

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে চাকু।

—সত্যি ভাই, এত লোক নামল গাড়ি থেকে কিন্তু আমাদের বয়েসি ছেলে একটিও নেই। ভারি অবিচার। ওই ছোড়দিমণির তো একটি ভাইও থাকতে পারত!

বল্টু বললে,—ঠিক। ঠিক। তাহলে আমরাও তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিতে পারতাম। একটা নিরিবিলি ঘর হয়তো ওরা ছেড়ে দিত। তাতে চলত আমাদের লুডো, স্নেকস অ্যান্ড ল্যাডার্স আর ক্যারাম খেলা।

টিপু টিপ্পনী কাটলে,—শুধুই কী খেলা? আমাদের থিয়েটারের রিয়ার্সেল বসিয়ে দিতাম ওখানে। পুজোর

সময় একটা নাটক তো আমাদের অভিনয় করতেই হবে।

টিপুর কথাগুলি মনে দাগ কাটল সবাইকার।

একটি অদেখা, অচেনা এবং একান্ত দরকারি বন্ধুর জন্যে ওরা সবাই আঁকুপাঁকু করতে লাগল। কিন্তু এই বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে বুড়ো আছে, জোয়ান আছে, কর্তা আছে, গিন্নি আছে, ঠাকুমা-দিদিমা আছে, বৌদি ও দিদিমণি আছে—; খুচরো খুকিরা আছে—নেই শুধু একটি কিশোর বালক—যে ওদের আপনার বলে অভ্যর্থনা করে নিতে পারে!

দুদিন বাদেই পাড়ায় এর পরিণতিটা লক্ষ্য করা গেল।

পাড়ার পেনসনপ্রাপ্ত বৃদ্ধের দল—ওই বাড়িতে বৈঠকখানা ঘরে দিব্যি বসে পড়ল। তাদের জন্য অন্দর মহল থেকে প্রায়ই আসতে লাগল—গরম মুড়ি আর পাঁপর ভাজা, বেগুনি আর ফুলুরি, হিংয়ের কচুরি আর ডালমুট। সেই সঙ্গে সাজানো কাপে ধূমায়িত চা।

ছেলের দল আশ-পাশে ঘুরঘুর করে আর বুড়োর দলের সৌভাগ্য দেখে হিংসেয় জ্বলে মরে।

ওদিকে পাড়ার গিন্নি-বান্নীরা অন্দর মহলে গিয়ে ও

বাড়ির মাসি-পিসিদের সঙ্গে দারুণ ঘনিষ্ঠতা করে বাঘ-বন্দী আর গোলকধাম খেলা শুরু করে দিয়েছে দুপুরবেলা।

পাড়ার দিদিমণিরাও পিছিয়ে নেই।

তারা সবাই ও বাড়ির দিদিমণির সঙ্গে ভাব করে ম্যাটিনি শো-র সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছে। পাড়ার নিন্দুকেরা একথাও সবাইকার কানে কানে বলে বেড়াতে লাগল যে, পাড়ার দিদিমণিদের কারও পয়সা অবধি দিতে হবে না। ওই বাড়ির দিদিমণির ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসে অজস্র নোট আর খুচরো পয়সা। শুধু কী আর সিনেমার টিকিট? সেই সঙ্গে ডালমুট আর পোট্যাটো চিপস চলতে থাকে সিনেমা দেখার সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু বিপদ পাড়ার ছেলের দলের।

ও বাড়িতে তাদের এমন কেউ আপনার জন নেই যাকে অবলম্বন করে তারা ওখানে প্রবেশ-অধিকার পেতে পারে, আর বুড়োদের মতো অধিকার করতে পারে একটি ঘর।

হানাবাড়ি বলে পাড়ায় যে বাড়িটির অখ্যাতি ছিল, যার দিকে কেউ ভুলেও একবার চোখ তুলে তাকাত না—সেই হর্ম্যটি যেন নতুন রূপ লাভ করছে। সারা বাড়ি সন্ধে থেকে জোরাল বিদ্যুতের আলোতে ঝলমল

করছে। ঘরে ঘরে মজলিস, ঘরে ঘরে গানের আসর। নীচের বৈঠকখানায় দামি অম্বরী তামাকের গন্ধে ম-ম করছে। পথচলতি পথিকও থেমে থাকছে একটু সময়।

ছেলের দল মুখ শুকনো করে বাড়ির আশ-পাশে ঘুরে বেড়ায়, কেউ তাদের কাছে ডেকে কুশল জিগ্যেস করে না, আদর করে ঘরে বসিয়ে মিষ্টির থালা হাতে তুলে দেয় না।

এ মর্ম বেদনার কথা বলাও যায় না, সওয়াও যায় না!

চাকু কিন্তু কিছুতে হাল ছেড়ে দিতে রাজি নয়। তক্কে তক্কে আছে কী করে ও বাড়ির একটি জ্যান্ত প্রাণীর সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলবে।

সত্যিকারের সাধনা যদি থাকে—তবে সিদ্ধিলাভ হবেই।

ও বাড়ির চাকরের কাছে চাকু একদিন খবর পেলে, বুড়ি দিদিমা রোজ রিকশা করে গঙ্গাস্নানে যায়—দুপুরবেলা। বাড়িসুদ্ধ মানুষের খাওয়া-দাওয়া যখন চুকে যায়—তখন বুড়ি ঠুকঠুক করতে করতে রিক্সাতে গিয়ে ওঠে। সঙ্গে থাকে একটি খাগড়াই ঘটি। সেই ঘটিতে দিদিমা গঙ্গা জল নিয়ে আসে।

খবরটা পেয়ে চাকুর মনে আশার সঞ্চার হল। গঙ্গাস্নান করে ফিরতি মুখে দিদিমা কি কোনওদিন একটু বিপদে পড়বে না? হয়তো স্নান করে ওঠবার সময় মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। কিংবা রিক্সায় ওঠবার মুখে পাগলা কুকুরে তাড়া করবে, না হয় গঙ্গা জলের ঘটিটা সিঁড়ির ওপর ফেলেই রওনা হবে বাড়ি! তক্ষুনি তড়িৎবেগে এগিয়ে আসবে চাকু, বিপদ থেকে উদ্ধার করবে বুড়ি দিদিমাকে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দিদিমা জিগ্যেস করবেন, —হ্যাগো বাছা তুমি কোন বাড়ির ছেলে? ভাগ্যিস তুমি ছিলে তাই আমি বিপদ থেকে বাঁচলাম। চলো আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে।

চাকুর এই আকাঙক্ষা কি একদিনও পূর্ণ হবে না? এই মনোবাসনা নিয়ে সবাইকে না জানিয়ে চাকু রোজই গঙ্গার ঘাটে আনাগোনা শুরু করে দিলে।

অবশেষে বেড়ালের ভাগ্যে একদিন শিকে ছিঁড়ল। সেদিনটি ছিল রবিবার।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে খড়কে দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে চাকু গিয়ে হাজির হল গঙ্গার ধারে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলে, দিদিমার রিক্সা তখনও এসে পৌঁছয়নি।

একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল চাকু।

কত লোক স্নান করে ঘরে ফিরে যাচ্ছে—সাধু, সন্ন্যাসী গৃহী বৈষ্ণব অন্ধ-আতুর, ভিখিরি রাস্তার ছেলেরা, ঘরের বউ-ঝিয়েরা।

চাকু উসখুস করতে থাকে। যার জন্যে এই রৌদ্দুরে ছুটে আসা তার আর দেখা নেই।

অবশেষে তার ভাগ্য প্রসন্ন হল।

দূর থেকে দেখা গেল ঠুং ঠুং শব্দ করতে করতে মন্থর গতিতে আসছে একটি রিক্সা; তাতে বসে আছেন দিদিমা, হাতে একটি ঘটি। আর তার পাশে আজ আবার দিদিমণি বসে!

চাকু একটি গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল।

গায়ে পড়ে আলাপ করতে গেলে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে। একটা বিপদ ঘনিয়ে এলে তবে তো সে ছুটে যেতে পারে। অন্তত গোয়েন্দা কাহিনিগুলিতে তাই লেখা থাকে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল চাকু একটা ছায়ায়-ঢাকা গাছের তলায়। দুই হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হেই ভগবান, আমি যদি জীবনে কোনও পুণ্যির কাজ করে থাকি—তাহলে নিদেনপক্ষে ছোটখাটো একটা

বিপদও এনে দাও—যাতে আমি ওদের বাঁচিয়ে দিতে পারি। আর সেই সঙ্গে পাসপোর্ট পেয়ে যাব ওই হানাবাড়িতে ঢোকবার।

ভগবান বোধ করি শেষ পর্যন্ত ওর কথা শুনলেন। ওরা দুটিতে গুটি গুটি যেই স্নান সেরে ওপরে উঠে এসেছে—অমনি কোত্থেকে একটা পাগলা মোষ ছুটে এল দিদিমণির দিকে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, দিদিমণির পরণে ছিল টকটকে লাল একখানি শাড়ি। তাতেই মহিষাসুরের যত ক্রোধ।

চাকু একটা বিপদের জন্যে তৈরি হয়েই ছিল। লাফিয়ে এসে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দিদিমণিকে মোষের শিঙের সামনে থেকে সরিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে চারদিকে একটা গেল গেলে রব উঠেছিল। চাকুর কেরামতি দেখে সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল। দিদিমা ছুটে এসে চাকুর মাথায় হাত বুলিয়ে কেবলি আশীর্বাদ করতে লাগলেন—

বললেন,—তুমি আমার নাতনির প্রাণ বাঁচিয়েছ বাবা। আর পনেরো দিন পরে ওর বিয়ে। তুমি না থাকলে ওর যে কী দশা হত ভাবতেও পারছি না। আমি ওকে আনতে চাইনি বাবা! ওই জোর করে আমার সঙ্গে আজ

গঙ্গা স্নানে এল। তুমি আমার মুখ রেখেছ বাবা। তোমার একশ বছর পরমায়ু হোক।

চাকু তাকিয়ে দেখল, দিদিমণি তখনও স্রোতের জলের লতার মতো থর থর করে কাঁপছে।

চাকু বললে,—কোনও ভয় নেই। শাড়ির লাল রঙ দেখেই মোষটা ক্ষেপে গিয়েছিল। আমিই আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দেব।

দিদিমা তখন একটু নিঃশ্বাস ফেলে শান্ত হয়েছেন। চাকুর মাথায় হাত বুলোতে জিগ্যেস করলেন—আচ্ছা বাবা তুমি কোন্ পাড়ায় থাকো।

চাকু রাস্তার নাম করলে।

দিদিমণির মুখে এইবার কথা শোনা গেল। উত্তর দিলে,—আমরাও যে ওই রাস্তাতেই থাকি।

চাকুর চাইতে এ খবর আর কে বেশি জানে? বললে,—ঠিক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের।

দিদিমা তখন প্রাণ খুলে চাকুকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

বীরদর্পে চাকু যখন ওদের নিয়ে হানাবাড়িতে ঢুকল— গোটা পাড়ার ছেলেরা চোখগুলি বড় বড় করে তাকিয়ে রইল সে দিকে।

কী মন্তরে চাকু ও-বাড়িতে ঢোকবার প্রবেশপত্র পেল এই কথা ভেবে পাড়ার ছেলেদের ঘুম নেই।

ওদিকে হানাবাড়ির লোকেরা যখন চাকুর বীরত্বের কথা শুনল—তখন তার আদর দেখে কে? দিদিমণির মা আসন পেতে সামনে বসিয়ে চাকুকে যে ধরনের আম আর যে রকমের মিষ্টি খাওয়াল চাকু তা জীবনে চাখেনি!

অথচ এই খানিক আগেও এ-বাড়িতে ঢোকবার কোনও উপায়ই তার ছিল না।

চাকুর বরাতটা ভালোই বলতে হবে।

দিদিমা বলেছেন,—আর পনেরো দিন পর দিদিমণির বিয়ে।

সেই বিয়েতে তাকে আর নেমন্তন্ন না করে উপায় আছে?

চাকু আপন মনেই ফিক ফিক করে হাসতে থাকে।

ওদিকে চাকু না হলে ও-বাড়িতে আর এক দিনও চলে না!

ঠাকুর্দা বলেন,—চাকু যেমন ভালো অম্বুরি তামাক কিনে আনতে পারে, এমন আর কেউ নয়।

বউদিরা চাকুকে দিয়ে রং মিলিয়ে মিলিয়ে উল কিনে

নিয়ে আসে, তাই দিয়ে ছোটদের জন্যে কত রকম জামা তৈরি করে।

দিদিমণির তো চাকু ভাই না হলে এক মুহূর্ত চলে না। কলেজ লাইব্রেরি থেকে বই আনতে হবে—দরকার চাকু ভাইয়ের। বন্ধুর বাড়ি চিঠি দিয়ে যেতে হবে—চাকু ভাইকে চাই। টেবিল-ক্লথের রং মিলিয়ে ছিট-কাপড় আনতে হবে—চাকু না হলে অন্য কারও কম্ম নয়। বোটানিকাল গার্ডেনে চড়ুই ভাতি,—চাকু ভাই সাথী।

লুকিয়ে বাড়ির বউদির ম্যাটিনি শো-র সিনেমা টিকিট কিনে আনতে হবে—চাকু ছাড়া আর কে পারবে বলো?

কাকাবাবু একখানা চিঠি দিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাঠাবেন—চাকু ছাড়া আর কারও ওপর তাঁর বিশ্বাস নেই।

জ্যাঠামশাইয়ের চেক ভাঙিয়ে আনতে হবে ব্যাঙ্ক থেকে—সেখানেও চাকুর ডাক পড়ে।

চাকু যখন এই ভাবে বাড়ির অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রাণী হয়ে উঠল—সেই সময় ধীরে ধীরে দিদিমণির বিয়ে এল এগিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির চেহারাও গেল বদলে!

নতুন করে রং দেওয়া হল গোটা বাড়িতে। কার্নিশে

কার্নিশে নতুন কারুকার্য, জানাল-দরজায় নতুন রঙের প্রলেপ।

চাকুর মুহূর্তমাত্র সময় নেই। দিদিমণি পছন্দমত বিয়ের শাড়ি ব্লাউজ কিনছে; নামকরা গয়নার দোকানে নতুন প্যাটার্নে গয়না গড়াতে দিচ্ছে, বন্ধুদের নেমন্তন্ন করবে বলে সোনার জলে চিঠি ছাপাচ্ছে, সব সময়ে চাকুর তার সঙ্গে থাকা চাই।

বন্ধুদের সঙ্গে দৈববাৎ দেখা হলে বলে,—ভাই মরবার ফুরসত নেই!

কেউ কেউ যদি কাতর আবেদন জানায়,—হ্যাঁরে চাকু, আমাদের নেমন্তন্ন হবে তো?

চাকু উর্ধ্বমুখী আঁখি করে উত্তর দেয়,—বিবেচনা করে দেখি!

দিদিমণির বিয়েতে চাকু প্রীতি উপহার ছাপাবার দায়িত্ব নিয়েছে। দিদিমণির কলেজের বন্ধুরা সব কবিতা লিখে দিয়েছে। ছাপার খরচ দেবে দিদিমণি নিজে। অনেক বলে কয়ে দিদিমণিকে রাজি করিয়েছে—চাকুও সেই সঙ্গে একটা কবিতা ছেপে দেবে।

চাকু কবিতা লিখবে শুনে বন্ধুরা তো একেবারে হা! কিন্তু ঘাবড়াবার ছেলে চাকু নয়। খানিকটা রবীন্দ্রনাথ,

খানিকটা সত্যেন দত্ত, খানিকটা নজরুল আর কিঞ্চিৎ কালিদাস রায় মিলিয়ে সে চমৎকার কবিতার মিক্সচার তৈরি করে ফেলেছে। যাদের কাব্য রোগে ধরেছে—তাদের পক্ষে একেবারে অব্যর্থ দাওয়াই।

ওদিকে ছাদে মনোহরণ ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। তারই তলায় বসে অভ্যাগতরা আহার করবে—লুচি-পোলাও থেকে শুরু করে রাবড়ি, ল্যাঙড়া আম অবধি।

চাকুর কাছে কাহিনি শুনে, পাড়ার ছেলেরা শুধু অলীক স্বপ্ন দেখে আর হাতের তালুতে জিব ঘসে!

তাইতো পাড়ার এমন নেমন্তন্নটা মাঠে মারা যাবে।

চাকুর কিন্তু এ ব্যাপারে দারুণ সুবিধে—

যখন যেটা খুশি চেখে বেড়াবে এই তার পরিকল্পনা। হয়তো গিয়ে একখানা লুচি নিয়ে মাংসটি চেখে দেখবে, তারপর দু-পাক কাজ করতে করতে—রাবড়িটা মুখে পুরে দেবে। যাতায়াতের ফাঁকে—দু-একটা ল্যাঙরা আমরে স্বাদ কি গ্রহণ করবে না? চাকু আপন মনে ভাবে আর আনন্দের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করে।

বিয়ের দিন সন্ধেবেলা দিদিমা ডেকে বলেন,—বাবা চাকু, তুমি একবার একটা রিকশা করে গঙ্গায় যাও। স্নান করে, কাপড় ছেড়ে এক ঘটি গঙ্গাজল নিয়ে এসো।

বিয়ের সময় দরকার হবে কী না!

চাকু মনে মনে ভাবে,—এ আরও ভালোই হল। গঙ্গার ধাবে ভ্রমণ...গঙ্গা-স্নান—এতে ক্ষিদেটা আরও জমবে। বেশ আমেজ করে সন্ধের পর ভোজ লাগানো যাবে।

চাকু অনেকক্ষণ ধরে চান করলে, গা-হাত-পা মুছে নতুন কাপড়-জামা পরলে। দিদিমণিই কিনে দিয়েছে। তারপর একঘটি গঙ্গাজল নিয়ে রিকশাতে উঠে ঠুং ঠুং করে রওনা হল।

ফিরতি মুখে হঠাৎ কোত্থেকে দানবের মতো একটা লরি এসে যে ওকে কী করে উলটে দিলে চাকু কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলে না।

রাস্তার লোকেরা যখন ওকে ধরাধরি করে তুলে একটা ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালে পাঠাচ্ছে—তখন চাকু বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল,—তোমরা আমায় কোথায় পাঠাচ্ছ গো? আমার যে নেমন্তন্ন আছে...!

বেড়ালের বোনপো

গাঁয়ের নাম তেঁতুলে।

একই স্কুল। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে দুটো দল।

এক দল খেলাধুলো, সাঁতার, হুটোপাটি, বনভোজন এই নিয়ে থাকতে ভালোবাসে, আর এক দল নাটক অভিনয় করতে ওস্তাদ।

প্রথম দল একটু ডানপিটে, ফুটবল খেলা পেলে আর কিচ্ছু চায় না, সাঁতার কাটতে যখন জলে নামে—তাদের জলের পোকা বলে ভুল করা খুবই স্বাভাবিক। আশেপাশে ফলের বাগান থাকলে যাদুকরের চাইতেও হাত সাফাইয়ে বাগান সাফ করে ফেলে। ট্রেন ভ্রমণে কারও না কারও সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধবেই...।

মোটকথা, চুপচাপ তারা বসে থাকতে পারে না। যখন কোনও কাজ জোটে না তখন বাজি রেখে গুনে গুনে বুক-ডন দিতে শুরু করে।

দ্বিতীয় দলের ছেলেরা একটু ছিমছাম। তারা সব সময় নাটুকে ভাষায় কথা বলে, পা মেপে মেপে চলে,

জ্যামিতি কষে কোণ মেপে মানুষের দিকে তাকায়। তাছাড়া এই দলের সবাই যাত্রাদলের মতো লম্বা লম্বা চুল রাখে।

কাজেই দুই দলের সঙ্গে যে মিলবে না এটা বলাই বাহুল্য। ওরা যদি যায় ডাইনে, তবে এরা যায় বাঁয়ে।

ওদের দুদলকে নিয়ে কোনও কাজ করতে হলে—স্কুলের মাস্টার মশাইরা হিমসিম খেয়ে যান। কেন না, কখনওই তাদের মতের মিল হয় না!

এই অবস্থাতেই স্কুল চলছে। কখন যে দু-কাঠি বাজনা শুরু হবে—কেউ জানে না!

যখন সত্যি লেগে যায়—গোটা স্কুলের ছেলের দল চিৎকরা করতে থাকে—নারদ—নারদ!

আশপাশের লোকেরা বলে,—ঢাকের বাদ্যি শুরু হল!

এমনি অবস্থায় হঠাৎ দশখানি গ্রাম তফাতে সদর থেকে এল এক চিঠি। সেখানকার বিদ্যালয়ের ছেলেরা এই স্কুলের ছেলেদের চ্যালেঞ্জ করেছে ফুটবল খেলায়।

কথায় বলে—

একে তো নাচুনি বুড়ি

তাতে আবার ঢাকের বাড়ি!

খেলাধুলো দলের ছেলেরা আনন্দে লাফাতে শুরু করে দিলে।

হুঁ-হুঁ! আমাদের ডেকেছে ফুটবল খেলায়। তোদের কি ডেকেছে নাটক করতে? স্কুলের মান যদি রাখি তো আমরাই রাখব। তোদের ওই প্যানপ্যানানি আর ঘ্যানঘ্যানানি কে শুনতে চায় বল? তার চাইতে দেখবি চল আমাদের 'কিক'!

কিন্তু থিয়েটারের দল 'কিক' দেখতে আদৌ রাজি নয়। কারণ ওদের একটা নাটকের মহলা শুরু হয়ে গেছে। প্রতিদিন প্যাঁ-পোঁ বাজনা বাজে, ঝমাঝম করতাল বাজে—আর সেই সঙ্গে হেঁড়ে গলয়া গান শোনা যায়।

খেলোয়াড় দল তাদের থোড়াই কেয়ার করে। ওদের মধ্যে সাজসাজ রব পড়ে গেল। স্কুল থেকে এই কিছুদিন আগে নতুন জার্সি কেনা হয়েছে। সেগুলো ধোপাকে দিয়ে ভালো করে কাচাতে হবে, ইস্তিরি করাতে হবে, নজর রাখতে হবে যাতে পোশাকগুলোর রং জ্বলে না যায়।

ছেলেদের উৎসাহের প্রবল স্রোতে তরতর করে

এগিয়ে গেল সব কাজ। অবশেষে তারা একদিন ক্লাবের ক্যাপ্টেনের অধিনায়কতায় ট্রেনে করে রওনা হল—সেই দশখানি গ্রাম পরে সদরে।

ওখানে পৌঁছে ওরা দেখলে যে, এক জমিদার বাড়িতে ওদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

দেখে শুনে খেলোয়াড় দল খুব খুশি।

যুদ্ধের অনেক আগের ঘটনা। তাই নাই নাই, খাই খাই ভাবটা দেশে আদৌ ছিল না। তার ওপর জমিদার বাড়ি। সকাল থেকে ক্রমাগত খাবার আসছে। কে কত খাবে, খাও না?

ছেলেদেরও আবদারের অন্ত নেই!

এই চাই গরম চা—, তার খানিক বাদেই ঠান্ডা সরবৎ, আবার দাও নারকেল-মুড়ি! একটু পরেই কফি, ডাব....

ওদের কাণ্ড দেখে স্বয়ং জমিদারবাবুও খুব হাসেন। বলেন,—আমিও ছেলেবেলায় ভালো ফুটবল খেলতাম। এখন খেলাধুলো ছেড়ে দিয়ে বাতে পঙ্গু হয়ে আছি। নিজে খেলতে পারি না বটে—তবু ফুটবল খেলা দেখতে খুব ভালোবাসি। তোমরা যদি ম্যাচে জিততে

পারো—তাহলে আমি নিজে তোমাদের একটা উপহার দেব।

জমিদারবাবুর কথা শুনে ছেলেরা নতুন করে উৎসাহিত হয়। দুপুরবেলা সেদিন বিরাট ভোজ। ক্যাপ্টেন সবাইকে চুপি চুপি বলে দিলে,—কেউ আণ্ডে-পিণ্ডে গিলবে না। তাহলে কেউ ছুটোছুটি করতে পারবে না, আর ম্যাচ খেলাও মাথায় গিয়ে উঠবে।

স্থানীয় লোকেরা আর স্কুলের ছেলেরা জমিদার বাড়ির ঠাকুরকে টিপে দিয়েছে। বলেছে, খুব করে খাওয়াবি ওদের। একেবারে যাকে বলে ফাঁসির খাওয়া। তাহলে আর বাছধনেরা ছুটোছুটি করে খেলতে পারবে না। আমাদের গাঁয়ের স্কুলই শেষ পর্যন্ত জিতে যাবে।

জমিদার বাড়ির ঠাকুর যত ওদের পাতে বেশি করে মাংস দিতে আসে—ততই ওরা দুহাতের চেটো দিয়ে থালাগুলো আগলে রাখে।

ওরা বেশ বুঝতে পেরেছে—এই কৌশলে অকেজো করে ফেলবার মতলব।

তাতে কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ওরা জানে, ভালো করে খেললেই ওরা প্রতিযোগিতায় জিততে পারবে।

তখন স্কুলের সুনাম হবে। সবাই খাতির করবে। জমিদারমশাই ভোজের আয়োজন করবেন। তখন যত খুশি পেট পুরে খাও না!

শেষ পর্যন্ত ছেলেরা নিজেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলে। সামান্য মাছের ঝোল-ভাত খেয়েই দুপুরবেলার খাওয়া শেষ করে দিলে। কারণ ওরা জানে ঠিক চারটেয় ম্যাচ শুরু।

ওদের ভাগ্যি ভালো যে, সেদিনের আবহাওয়াটা ভালো ছিল। দু'দিন বৃষ্টি হয়নি। মাঠটা বেশ খটখটে।

হ্যাঁ, তেঁতুলে গাঁয়ের ছেলেরা খেললে বটে। বলটাকে নিয়ে যেন তারা যাদুকরের খেলা দেখালে। এই এখানে—তারপরেই এখানে—পরমুহূর্তেই বিপক্ষ দলের গোলের ভেতর। জমিদারবাবু বাতে কাবু, কিন্তু তাঁর উৎসাহের অভাব নেই।

পালকি করে সিধে চলে এসেছেন খেলার মাঠে। সেইখানে বসে বসেই খেলা দেখছেন। মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে ছেলেদের উৎসাহিত করছেন।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল—তেঁতুলে গ্রামের ছেলেরা চার গোলে জিতে শিল্ড নিয়ে নিলে।

তখন তাদের সম্মান দেখে কে!

আশপাশের গাঁয়ের লোকেরা ছেলেদের কাঁধে তুলে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। জমিদারবাবু বাতে পঙ্গু পা নিয়েই ওদের সবাইকে আর্শীবাদ করলেন।

রাত্তিরে বিজয়ী খেলোয়াড়দের সম্মানে জমিদার বাড়িতে বিরাট ভোজের আয়োজন করা হল, তাতে দুই দল খেলোয়াড়ই আমন্ত্রিত হল। এর পরে আছে গানের মজলিস।

আলোয় আলোময় হয়ে গেল জমিদার বাড়ি। ভোজেরই বা কী বিপুল আয়োজন।

এইবার তেতুঁলে দলের খেলোয়াড়রা দেখিয়ে দিলে—তারা যেমন ভালো খেলতে পারে—তেমনি ভোজনেও পটু!

নৈশভোজের পর সঙ্গীতের মজলিস। সে মজলিস ভাঙতে অনেক রাত হয়ে গেল।

একটা হল-ঘরে তেঁতুলে গাঁয়ের ছেলেদের থাকবার জায়গা হয়েছে। উঁচু গদি আর তোশক। তার ওপর নরম বিছানা। বালিশের ঢাকনির ওপর কারুকার্য করা। এত আরামে কি আর ঘুম আসে!

তার ওপর প্রচুর মাংস-পোলাও খাওয়া হয়েছে। খেলোয়াড় দল এপাশ-ওপাশ করতে লাগল! এর মধ্যে কেউ কেউ আবার দুমিনিটেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দুটি ছেলের কিছুতেই ঘুম আসে না।

বাঘা আর বিল্টু।

শেষ কালে ওরা ফিস ফিস করে গল্প শুরু করে দিল। হঠাৎ ওরা একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে কান খাড়া করে রইল—।

অ্যাঁ—ও—ও!

বেড়ালের শব্দও নয়, আবার বাঘের আওয়াজের মতো তত জোরালও নয়—কিন্তু ডাকটা ভারি অদ্ভুত।

আবার—অ্যাঁ—ও—ও!

বাঘা আর বিল্টু এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। মনে হচ্ছে আশপাশেই কোনও জানোয়ার যেন ডাকছে।

এই সদরের পাশেই একটা বিরাট বন। সেখান থেকে কোনও হিংস্র জানোয়ার বেরিয়ে এল কী না তাই বা কে জানে! দুই বন্ধু তখন পা টিপে টিপে উঠে পড়ল। হাত তাদের টর্চ।

দরজা খুলে বাইরের টানা লম্বা বারান্দায় এসে

হাজির হল বাঘা আর বিল্টু।

আবার সেই আওয়াজ—

অ্যাঁ—ও—ও!

হুঁ! পাশের ঘর থেকেই তো আওয়াজটা আসছে।

ওরা দুই বন্ধু এগিয়ে গেল পাশের ঘরের দিকে। কিন্তু একী কাণ্ড!

পাশের ঘরে তো তালা দেওয়া।

দরজাটা একটু ঠেলতেই বেশ খানিকটা ফাঁক হয়ে গেল। তার ভেতর দিয়ে ফেলা হল জোরাল টর্চ।

তাইতো! তাজ্জব ব্যাপার!

একটি বাঘের বাচ্চা বাঁধা আছে শিকল দিয়ে। টর্চ বন্ধ করলে—অন্ধকারের ভেতর ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছে!

সেই শ্রীমান মাঝে মাঝে চিৎকার করছে—অ্যাঁ—ও—ও!

বাঘা বললে,—চমৎকার জন্তুটি তো, ওকে হস্তগত করতে হবে!

বিল্টু বললে,—আচ্ছা বেড়াল তো বাঘের মাসি, কিন্তু বাঘ বেড়ালের কী হয়?

বাঘা গবেষণা করে উত্তর দিলে,—বাঘ হচ্ছে বেড়ালের বোনপো। —বেশ! তাহলে আমরা ওকে বেড়ালের বোনপো বলেই ডাকব।

—ভারি মজা! ফুটবল খেলতে এসে বেড়ালের বোনপো লাভ।

—লাভ হল সে কথা তোকে কে বললে? জমিদারবাবু যে এমন সুন্দর জানোয়ারটি ছেড়ে দেবেন—এমন তো মনে হয় না।

বাঘা আর বিল্টু আলোচনা করতে করতে ফিরে এসে আবার নিজেদের বিছানায় গা এলিয়ে দিলে।

পরদিন বেশ বেলাতে ওদের ঘুম ভাঙল। বাঘা আর বিল্টু কিন্তু ঘুমের ভেতরও বাঘের বাচ্চার স্বপ্ন দেখেছে। কাজেই ঘুম থেকে উঠতেই ওদের রাত্তিরের সব কথা মনে পড়ে গেল।

বিল্টু বললে,—চল, আগে জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করি। ওই বেড়ালের বোনপো না নিয়ে আমরা কিছুতেই এখান থেকে নড়ছি নে।

বাঘাও খুশি হয়ে বললে,—ঠিক কথা। আমরা ম্যাচে জিতলে জমিদারবাবু আমাদের উপহার দেবেন

বলেছিলেন। এই মজাদার উপহারটি বাগিয়ে নিতে হবে, বুঝলি?

কাউকে কিচ্ছু না জানিয়ে দুই বন্ধু দোতলায় জমিদারবাবুর বসবার ঘরে গিয়ে হাজির হল। তিনি তখন বসে গড়গড়ায় তামাক টানছিলেন। ওদের দেখে ভারি খুশি হলেন তিনি।

বললেন,—এসো বাবাজিরা, কাল তোমাদের খেলা দেখে আমি ভারি খুশি হয়েছি। ম্যাচে জিতেছ বলে তোমাদের একটি পুরস্কার দেব। কী পুরস্কার তোমরা চাও, বলো।

বিল্টু তাড়াতাড়ি বলে উঠল,—আমাদের পাশের ঘরে আপনার একটি বাঘের বাচ্চা শেকলে বাঁধা আছে দেখলাম। যদি আমাদের খেলা দেখে আপনি খুশি হয়ে থাকেন—তাহলে ওই বাঘের বাচ্চাটি আমাদের উপহার দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঘা ফোড়ন কাটলে, —হ্যাঁ স্যার, ওই বেড়ালের বোনপোকেই আমরা চাই—

ওর কথা শুনে জমিদারবাবু অট্টহাসিতে একেবারে ফেটে পড়লেন। বেড়ালের বোনপো। বেশ বলেছ

তুমি। বেড়াল যেমন বাঘের মাসি—বাঘ তেমনি বেড়ালের বোনপো। সম্পর্কটা খুঁজে খুঁজে ঠিক বের করেছ তো?

বিল্টু কিন্তু নাছোড়বান্দা। আবার কথাটাকে মনে করিয়ে দিলে।

—তা বেড়ালের বোনপোটাকে আমাদের দেবেন তো?

জমিদারবাবু গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতে টানতে উত্তর দিলেন,—ও আর এমন বেশি কথা কী? আমার জমিদারির ভেতর যে জঙ্গল আছে—সেখানকার কাঠুরে প্রজারা ওটা আমায় ধরে দিয়েছে। এ রকম গভীর জঙ্গলে প্রায়ই ধরা পড়ে। তা তোমরা এই বেড়ালের বোনপোটাকে নিয়ে যাও না!

উপহারটা পেয়ে ওদের আর আনন্দের সীমা নেই। তক্ষুনি নীচে নেমে এসে বন্ধু মহলে এই সুখবরটা ছড়িয়ে দিলে।

হই হই রই রই পড়ে গেল তেঁতুলে গাঁয়ের দলে।

একে তো ম্যাচ জিতে শিল্ড লাভ, তার ওপর আবার বাঘের বাচ্চা নিয়ে গাঁয়ে ফিরতে পারবে। সে

কী কম গর্বের কথা?

কিন্তু বাঘের বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবে কী করে? সেইটে একটা মস্ত বড় প্রশ্ন।

বিল্টু এগিয়ে এসে উত্তর দিলে,—সেজন্যে তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। ওকে নিয়ে যাওয়ার সব দায়িত্ব আমি নিলাম।

তখন সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

তারপর এসে গেল বিদায়ের পালা।

জমিদারবাবু বাঘের বাচ্চা ছাড়াও তেঁতুলে গাঁয়ের ছেলেদের অনেক জিনিস উপহার দিলেন। আর সেই সঙ্গে কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি।

স্থানীয় ক্লাব ব্যান্ড বাজিয়ে ওদের সবাইকে স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দিলে। এখানকার ইস্কুলের ছেলেরাও ওদের আনন্দ করে বিদায় অভিনন্দন জানালে।

বিল্টু ইতিমধ্যে বাঘের বাচ্চাকে নেওয়ার জন্যে এক অদ্ভুত পরিল্পনা করে ফেলেছে। কোলে বাঘের বাচ্চা নিয়ে তাকে দিব্যি চাদরে ঢেকে নিয়েছে, আর ছেলেদের বলে দিয়েছে—তার ঠিক সামনেই থাকবে বিরাট শিল্ডটা। সকলের দৃষ্টি সেই শিল্ডের ওপরে গিয়ে

পড়বে। বেড়ালের বোনপোর কথা কেউ জানতেও পারবে না।

হলও তাই। সবাই শিল্ড দেখতে লাগল। কিন্তু শিল্ডের আড়ালে বিল্টুর কোলে যে বাঘের বাচ্চা লুকিয়ে আছে, সে কথা কেউ জানতেও পারলে না! তাছাড়া যে ব্যান্ডের আওয়াজ, আর লোকজনের চিৎকার—তাতে অন্য দিকে নজর দেওয়ার কারও সময় ছিল নাকি?

স্টেশনে ওরা একটা বড়সড় গাড়িতেই উঠে পড়ল। কিন্তু ফেরবার গাড়ি তো আর রিজার্ভ করা ছিল না। কাজেই বাইরের যাত্রীও কিছু কিছু উঠে পড়ল সেই গাড়িতে।

কামরায় উঠে একটা মুশকিল হল এই যে, বেড়ালের বোনপো মাঝে মাঝে ডেকে উঠেছিল—অ্যাঁ—ও—ও!

তখন অন্যান্য যাত্রীরা এদিক ওদিক চাওয়া-চাওয়ি করে। একজন মারোয়াড়ি যাত্রী ছিল গাড়িতে। সে ভয় পেয়ে বললে,—বাঘ কা বাচ্চা কাঁহা সে লে আয়া লেড়কা লোক?

ছেলের দল তখন হেসেই কথাটা উড়িয়ে দিলে।

বাঘা বললে,—বাঘ আছি আমি। আলাদা বাঘ আর কেউ নেই। তারপর থেকে যখুনি বাঘের বাচ্চা ডেকে উঠতে লাগল—ছেলের দল সেই ডাকটাকে ছাপিয়ে নিজেরাই চিৎকার করে উঠতে শুরু করল—অ্যাঁ—ও—ও!

তখন অন্যান্য যাত্রীরা মনে করে নিলে, ব্যাপারটা আগাগোড়াই ছেলের দুষ্টুমি! মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের ভয়টাও এইভাবে ধীরে ধীরে কমে গেল।

বিল্টু তখন একবারে নিশ্চিন্ত।

সবাই হুল্লোড় করে মিষ্টির হাঁড়ি খুলে বসল।

বাঘের বাচ্চাটিকে রাখা হয়েছিল অতি সুন্দর করে লুকিয়ে। একটা বেঞ্চের পায়ার সঙ্গে ওকে বেঁধে বেঞ্চের তলাতেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। আর সামনে আড়াল করা ছিল বিরাট শিল্ডটি। তাতে বাঘের বাচ্চাটিকে আর কেউ দেখতে পাচ্ছিল না। অবশ্য আগাগোড়া পাহারায় ছিল বিল্টু।

গাঁয়ের স্টেশনে নেমে আর এক হাঙ্গামা। বেড়ালের বোনপোকে প্ল্যাটফর্মের বাইরে নিয়ে যাওয়া যাবে কী করে?

সে ব্যাপারেও বিল্টু চটপট ব্যবস্থা করে ফেললে। বাঘের বাচ্চাকে চাদরে ঢেকে বিল্টু কোলে নিয়ে থাকবে। আর ছেলের দল ঠিক সামনেই শিল্ড নিয়ে কোলাহল করতে করতে এগিয়ে যাবে। কাজেই সকলের দৃষ্টি পড়বে শিল্ডের দিকে। এই ভাবে ওরা অতি সহজেই প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।

এই ভাবে বাঘ নিয়ে গাঁয়ে ফিরে ওদের দাম অনেক বেড়ে গেল।

বিল্টু তো রাতারাতি একজন 'হিরো' হয়ে গেল। বাঘের বাচ্চাটা ইতিমধ্যে তার বেশ পোষ মেনেছে। সে প্রত্যহ বিকেলবেলা বাঘের বাচ্চার গলায় শেকল পরিয়ে খেলার মাঠে নিয়ে যেত—আর সারা গাঁয়ের ছেলের দল সেইখানে ভিড় করত। এ কুকুর নয়, বেড়াল নয়, বানর নয়—একেবারে জ্যান্ত বাঘ। তাই ভিড়টা ক্রমশ বেড়ে যেতে লাগল। অন্য গাঁয়ের ছেলেরাও এই বেড়ালের বোনপোকে দেখবার জন্যে খেলার মাঠে দলে দলে এসে জড়ো হতে লাগল।

এর মধ্যে একদিন সকালবেলা বিল্টু ও বাঘা জানতে পারলে যে, তাদের স্কুলের নাটুকে দল সেদিন

সন্ধেবেলায় 'রাবণ বধ' অভিনয় করবে! ওরা দুই বন্ধুতে গোপনে কী যেন পরামর্শ করল—কাক-পক্ষীতেও জানতে পারল না।

যথা সময়ে সন্ধেবেলায় কনসার্ট বাজতে লাগল। ছেলেদের ভিড়ে হলঘরে এতটুকু জায়গা নেই। আশপাশের গ্রামের স্কুলের ছেলেরাও খবর পেয়ে এসেছে। 'রাবণ বধ' নাটক দেখতে কার না ইচ্ছে হয়।

সবাইকার জায়গা হলের ভেতর হয়নি। এক-এক দল টানা লম্বা বারান্দায়, কোনও কোনও দল সামনের গাছতলায়, আবার অন্য দল রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। তাদের সমবেত কোলাহলে কান পাতে কার সাধ্যি।

আর একটু বাদেই তৃতীয় ঘন্টা বাজবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ড্রপ উঠে যাবে।

বিল্টু আর বাঘা ঘাপ্‌টিমেরে ঠিক ফুটলাইটের নীচেই অন্ধকারের মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে।

বিল্টুর গায়ে একটা সাদা চাদর জড়ানো। ওরা দুজনে ফিস ফিস করে কী সব কথা বলছে। সেদিকে কেউ কান দিচ্ছে না। যে যার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে

গল্প জমাতেই মশগুল।

ঢং করে তৃতীয় ঘণ্টা বাজল। কনসার্ট থেমে গেল। আর দড়িতে টানা ড্রপ উঠে গেল ওপরে।

দৃশ্যটির পরিকল্পনা করা হয়েছে একটু নতুন ধরনে। রাবণ সীতাকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে। আর জটায়ু আকাশপথে উড়ে এসে রাবণ রাজাকে আক্রমণ করছে।

জটায়ুর দেহটা কপিকলের সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেতর থেকে নির্দেশ আছে যে, আস্তে আস্তে দড়িটা ঢিলে করে জটায়ুকে আকাশপথ থেকে নীচে নামিয়ে আনা হবে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সকলে নাটক দেখছে। জটায়ু হুঙ্কার দিয়ে আকাশপথে নেমে আসছে। রাবণ রাজা তলোয়ার খুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

এমন সময় বিল্টু করলে কী বাঘের বাচ্চাটিকে আস্তে আস্তে ফুটলাইটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে।

বাঘের বাচ্চা আওয়াজ করে উঠল—অ্যাঁ—ও—ও!

জটায়ু আকাশপথ থেকে বাঘটাকে দেখতে পেয়ে বুকফাটা চিৎকার করে উঠল, বা—ঘ, বাঁ—চা—ও!

ওদিকে উইংস-এর পাশে দাঁড়িয়ে যে দুটো ছেলে

দড়ি হালকা করে ধীরে ধীরে জটায়ুকে নামিয়ে আনছিল —তারা বাঘ দেখে দড়ি-টড়ি ছেড়ে একেবারে প্রাণের দায়ে পোঁ—পাঁ দৌড়।

ধপাস করে জটায়ু এসে পড়ল স্টেজের ওপর একেবারে রাবণ রাজার ঘাড়ে! ধাক্কা খেয়ে সীতা দেবীর পরচুলা গেল খুলে!

জটায়ু তখন গোঁ-গোঁ শব্দ করছে! ভেতরে চিৎকার শোনা গেল,—ড্রপ—ফেল,—ড্রপ ফেল।

চেঁচামেচি, কান্নাকাটি, হুল্লোড়, ঠেলাঠেলির ভেতর দিয়ে ড্রপ পড়ল!

ততক্ষণে বিল্টু আর বাঘা ভিড়ের ভেতর দিয়ে বেড়ালের বোনপোকে নিয়ে পালিয়ে গেছে!

পরীক্ষা কী ঝকমারি!

আজ সকাল থেকে খোদনের মরবার ফুরসত নেই! আজ স্কুলে তার শেষ পরীক্ষা!

যে-সে পরীক্ষা নয়—একেবারে স্মরণশক্তির পরীক্ষা! খোদন অবশ্য সেজন্য কিছু ভয় পায় না! সব কিছু তার একেবারে কণ্ঠস্থ—ঠোঁটস্থ—মুখস্থ! যে প্রশ্নই মাস্টার মশাই জিগ্যেস করুন—একেবারে গড় গড় করে বলে দেবে খোদন।

আকবর কোন সালে সিংহাসনে বসল, শিবাজী কী ভাবে কাকে ঠকিয়ে দিল্লির কারাগার থেকে পালিয়ে এল, মেঘ থেকে কী করে বৃষ্টি হয়, স্বাস্থ্যরক্ষার সহজ উপায় কী কী, মাধ্যাকর্ষণ কার আবিষ্কার, সুয়েজখাল কার পরিকল্পনায় খনন করা হল, ব্যাস্টাইলের কী ভাবে পতন ঘটল, সতীদাহ-প্রথা কে রোধ করল, বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ কে ছাপলে......এসব জরুরি ও প্রয়োজনীয় খবর খোদনের মগজে কিলবিল করছে।

ঠকাক দেখি কেউ তাকে? সেটা আর হচ্ছে না! খোদনের মস্তিষ্কে বহুবিধ খোপ আছে—লাইব্রেরিতে

বিভিন্ন তাকে যেমন বই সাজানো থাকে। খোদনের মগজের ফোকরে ফোকরে—এই সব আজগুবি প্রশ্ন আর তার জবাব মজুত করা আছে। যে কোনও র‍্যাক থেকে টানলেই উত্তর বেরিয়ে আসবে।

খোদন আপন মনে মুচকি মুচকি হাসে আর বিড়বিড় করে প্রশ্নের উত্তর বলে।

ওদিকে খোদনের বাড়িতে সকাল থেকেই একেবারে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

শ্রীমানের বাৎসরিক পরীক্ষার আজ শেষ দিন। এই পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বাড়িসুদ্ধ সবাই পশ্চিম দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হবে। এতদিন রওনা হয়ে যাওয়ার কথাই ছিল—শুধু খোদনের জন্যে যা আটকা। আজ ওর পরীক্ষা শেষ—তাই সবাই ঠিক করেছে শ্রীমানের পরীক্ষার পরই দল বেঁধে সবাই গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসবে।

সকাল থেকেই এ বাড়িতে কাজের কামাই নেই। খোদনের মা ঘুম থেকে উঠেই চাকরকে ডেকে বললেন, গণশা, শিগগির বাজারে চলে যা, আজকে টাটকা জ্যান্ত মাছ নিয়ে আসতে হবে। আজ খোদন মৎস্য-যাত্রা করে পরীক্ষা দিতে যাবে। জ্যান্ত মাছ দেখে রওনা হলে—সুফল হাতে হাতেই পাওয়া যাবে।

ওদিকে ঠাকুমা ভোরে উঠেই মালা জপ শুরু করেছেন। তিনি ঠাকুরঘর থেকেই ডেকে বললেন,—ওরে ঝি, এক খুরি চিনিপাতা দই এনে রাখ। ভাত-পাতে আজ দই খেয়ে যেতে হয়। তারপর আমি দইয়ের ফোঁটা দিয়ে দেব কপালে। দইয়ের ফোঁটা কপালে থাকলে সর্ব-অমঙ্গল দূর হয়।

ঠাকুরদা বৈঠকখানা ঘরে বসে খুক খুক করে কাশছিলেন। তিনি তাঁর গোমস্তাকে ডেকে বললেন,—ওহে বিরিঞ্চি, তুমি একবার এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো তো—

বিরিঞ্চি এসে জিগ্যেস করলে,—আজ্ঞে, কোথায় যেতে হবে বলছেন কর্তা?

ঠাকুরদা হুঁকোতে একটা সুখ-টান দিয়ে উত্তর দিলেন,—সোজা চলে যাবে কালীঘাটের মা কালীর মন্দিরে! সেখানে আমার নিজস্ব পাণ্ডা হালদাররা আছেন। তাঁদের বলে একটা পুজো দিয়ে প্রসাদ, মালা, ফুল, বেলপাতা, জবাফুল সব নিয়ে আসবে। খোদনের পকেটে সব পুরে দিতে হবে। পরীক্ষার সময় এই সব জিনিস সঙ্গে থাকলে আর কোনও ভয় নেই।

বিরিঞ্চি চট করে বললে,—আজ্ঞে আমি এক্ষুনি

রওনা হয়ে যাচ্ছি।

ঠাকুরদা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতে টানতে ব্যস্ত হয়ে বললেন,—ওর পরীক্ষায় রওনা হওয়ার আগেই ফিরে আসতে হবে কিন্তু। নইলে তোমার চাকরি থাকবে না—সে কথা আমি আগেই বলে দিচ্ছি।

খোদনের ছোড়দি ঘুম থেকে উঠেই মহাকার্যে ব্যস্ত। বাড়িতে যতগুলো ফাউন্টেন পেন আছে—সবগুলি জড়ো করে সে কেবলি কালি ভরছে।

ছোটকাকা জিগ্যেস করলে,—হ্যাঁরে পিন্টু, অতগুলো কলম এক সঙ্গে জড়ো করেছিস কেন? তোদের কলেজে কী কলমের প্রদর্শনী খুলবি না কি?

খোদনের ছোড়দি উত্তর দিলে,—না ছোটকাকা, আজ খোদনের মনে-রাখা পরীক্ষা কিনা। কিছুই তো বলা যায় না। হঠাৎ যদি কলম খারাপ হয়ে যায়! তাই বাড়িতে যতগুলো ফাউন্টেন পেন আছে সবগুলি কালি ভর্তি করে ওর পকেটে দিয়ে দেব। ওর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর একেবারে মুখস্থ কিনা! পাছে কলমের গোলমালে লিখে উঠতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ছোটকাকা বললে,—ঠিক! ঠিক!

ছোড়দি আপন মনেই ফোড়ন কাটলে,—হ্যাঁ, সাবধানের

মার নেই! কখন কী হয় বলা তো যায় না।

ওদিকে দোতলার ঘরে খোদনের বড় বউদি এক মহা সমস্যায় পড়েছেন। ট্রাঙ্ক থেকে খোদনের যত জামাকাপড় ছিল সব বের করে তিনি হিমসিম খাচ্ছেন।

ধোপা ব্যাটার বিরুদ্ধে তিনি তর্জন-গর্জন করে দিলেন।

মেজো বউদি হঠাৎ সেই ঘরে এসে ঢুকলেন। তিনি বড়দির মুখে ধোপার নাম শুনেই চেঁচিয়ে উঠলেন।

—তুমি করলে কী বড়দি? আজকের দিনে তুমি ধোপার নাম করলে? ঠাকুমা শুনলে আস্ত রাখবে না কাউকে!

ততক্ষণে বড়দি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। জিব কেটে চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন,—দ্যাখ মেজো, কাউকে বলিসনি যেন! আমার কী দোষ বল? কাপড়-জামাগুলোর অবস্থা দেখেছিস? আমি এখন কার সঙ্গে কী মিলাই বল?

মেজো মুচকি হেসে উত্তর দিলে,—কিন্তু তাই বলে তুমি সক্কালবেলা ওই নাম মুখে আনবে? ভাগ্যিস মাকুন্দোর নাম উচ্চারণ করোনি! তাহলে আমি ঠাকুমাকে বলে দিতাম!

বাড়ির বড় বউ একটু ভালো মানুষ। সে সাতেও থাকে না পাঁচেও থাকে না। তাই আর সব বউয়েরা

বড়দিকে খেপিয়ে আনন্দ পায়। বড়দি ফিস ফিস করে মেজো বউয়ের কানে কানে বললে,—দেখিস মেজো, আবার ভুল করে ঠাকুমার কানে কথাটা তুলিস নে। তাহলে আজ আমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

ছোট বউদি সুন্দর একটি আলপনা এঁকে ঠাকুরঘরে মঙ্গল-ঘট বসিয়ে রেখেছে। পরীক্ষা দিতে রওনা হওয়ার সময় ঠাকুমা খোদনের মাথায় একশ আটবার দুর্গানাম জপ করে দেবেন। ছোট বউদির হাত সত্যি ভালো। সুন্দর আলপনা দিয়েছে ঠাকুরঘরের মেঝেতে। ঠাকুমা খুশি হয়ে বললেন,—দিব্যি আলপনা হয়েছে। এই আলপনার ওপরকার মঙ্গলঘটে প্রণাম করলেই খোদন পাশ করে যাবে।

শুনে ছোট বউদি খুশিতে ডগমগ। তার আলপনার জন্যে খোদন পাশ করে যাবে—এ কী কম যোগ্যতার কথা। চাই কী ঠাকুমার কাছ থেকে এই জন্যে কায়দা করে একটি শাড়িও আদায় করে নেওয়া চলতে পারে।

এই সময় হঠাৎ বাড়ির উঠোনে একটা অঘটন ঘটল। একটি বাঁধা লোক ছিল। সে মাঝে মাঝে এই বাড়িতে এসে ধূপকাঠি দিয়ে যায়। মুশকিলের কথা লোকটি আবার মাকুন্দো। অন্য সময় হলে কোনও কথা ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে সে হঠাৎ বাড়ির উঠোনে ঢুকে হাঁক

দিলে—ভালো ধূপকাঠি চাই গো—

সঙ্গে সগে মারমুখো হয়ে ঠাকুমা তেড়ে এলেন।

—হ্যাঁগো বাছা, তুমি আর ধূপকাঠি বেচবার দিনক্ষণ পেলে না! একেবারে আজ সক্কালেই হাজির হয়েছ?

ঠাকুমার হুমকি শুনে ধূকপাঠিওলা তো একেবারে হকচকিয়ে গেল।

—কেন মা ঠাকরুণ, কী দোষ করেছি আমি?

ঠাকুমা আবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন—দোষ করোনি তুমি? ওই মুখখানা কী আজকে তোমার না দেখালেই নয় বাছা? না হয় ধূপকাঠি আজ বিক্রি না-ই করতে!

—আচ্ছা, তাহলে আমি যাচ্ছি মা-ঠান! কিন্তু ধূপকাঠিগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাব না। ও রইল তোমাদের ঠাকুরঘরের দাওয়ায়!

এক বাণ্ডিল ধূপকাঠি রেখে দিয়ে লোকটি পালাতে পথ পায় না!

তারপর খোদনের জয়যাত্রা পর্ব! কেউ নির্মাল্য এনে দিচ্ছে, কেউ দইয়ের ফোঁটা পরিয়ে দিচ্ছে কপালে, কেউ ফাউন্টেন পেনের অস্ত্রে সাজিয়ে দিচ্ছে। ঝি-চাকরের দল—জামা-জুতো, আয়না, চিরুনি নিয়ে একেবারে তটস্থ!

ঠাকুরদা গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছেন আর বলছেন,—

বিরিঞ্চি কী গিরেমেরে রইল না কি?

হন্তদন্ত হয়ে এমন সময় বিরিঞ্চি এসে হাজির। তার হাতে প্রসাদ আর জবাফুলের মালা। ঠাকুমা এসে প্রসাদ খাইয়ে দিলেন।

ঠাকুরদা জবাফুলের মালাটা পরিয়ে দিলেন গলায়।

খোদন কাঁদ কাঁদ সুরে বললে,—এই জবাফুলের মালা গলায় দিয়ে আমি কী করে স্কুলে যাব? রাস্তায় ষাঁড় আমাকে তাড়া করবে যে!

তখন বড় বউদি এগিয়ে এসে মালাটা তার বুক পকেটে গুঁজে দিলে।

দুর্গা দুর্গা শব্দে খোদন যেন বিশ্বজয় করতে রওনা হল।

এমন সময় চৌকাঠের ওপর টিকটিকিটা ডেকে উঠল—টিক-টিক-টিক—

ঠাকুমা বলে উঠলেন,—মা মঙ্গলচণ্ডী, সবদিক রক্ষা করো মা—

যতক্ষণ খোদন পরীক্ষা দিয়ে ফিরে না আসছে—বাড়িসুদ্ধ প্রাণী কেউ জল গ্রহণ করবে না! শুধু খোদনের ছোট বোনটা লুকিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে গোটা চারেক মাছ-ভাজা খেয়ে এল।

অবশেষে একটার পর খোদন এসে হাজির হল। সারা

হাতে কালি মাখা, জামায় কালি। কলমের মুখগুলো নাকি বেমক্কাভাবে খুলে গিয়েছিল।

ঠাকুরদা বললেন,—তা হোক! বেশি লিখলে এমন হয়েই থাকে। তা ভাই খোদন ক'টা প্রশ্নের উত্তর লিখলে?

খোদন ঠাকুরদার মুখে এই প্রশ্ন শুনে হকচকিয়ে গেল।

তারপর দুটো চোখ বড় বড় করে মাথা চুলকে খোদন উত্তর দিলে,—মানে আজকে আমার স্মরণ পরীক্ষা কি না! দুটো প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। আর—এই যাঃ, আর একটা প্রশ্নের উত্তর কী লিখেছি—বেমালুম ভুলে গেছি!

ঠাকুরদার হাত থেকে হুঁকোটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মেঝেময় জল গড়িয়ে পড়ল।

ঠাকুমা এগিয়ে এসে টিপ্পনী কাটলেন,—ওই মাকুন্দো লোকটা যখন উঠোনে এসে ঢুকল, তখুনি বুঝেছি—একটা অনর্থ হবে।
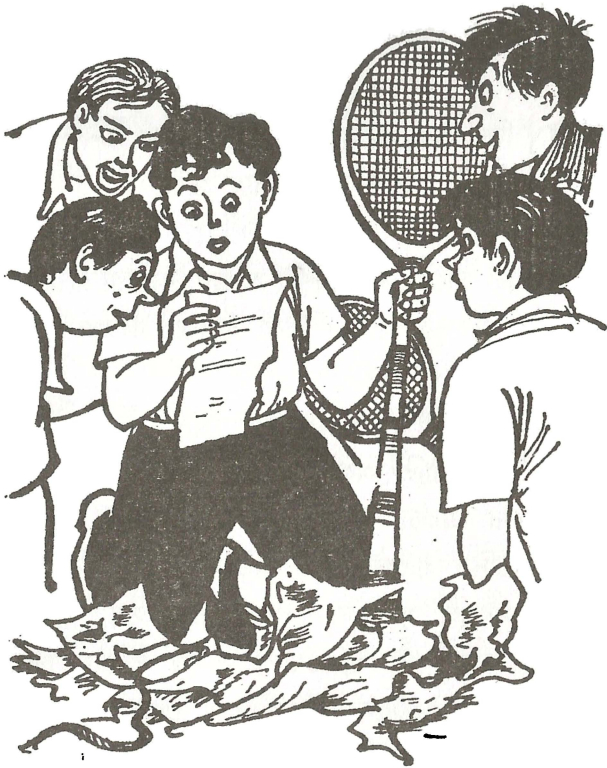
পুজোর উপহার

বাড়ির এক ছেলে হওয়ার যে চরম আনন্দ—তা চিরদিন ভোগ করে আসছে আমাদের চিরকালের নন্দদুলাল খোদন।

ঠাকুরদা আছেন, জ্যাঠামশাই আছেন, কাকারা রয়েছেন, দিদিদের দূর দূর অঞ্চলে বিয়ে হয়েছে, তারাও সবাই খোদন বলতে অজ্ঞান।

আমাদের এই সবাইকার প্রিয় খোদন স্কুলে টেনিস খেলায় খুব খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে।

একবার একটা ইংরেজি কাগজে ফোটো বেরুল খোদন টেনিস র‍্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে। হাসি মুখ। খোদন সবসুদ্ধ দু'ডজন কাগজ কিনে সব আত্মীয়-স্বজনের কাছে সেই ছবিওয়ালা কাগজ পাঠিয়ে দিল। ফলে খোদন একদিনে বিখ্যাত হয়ে গেল।

নানা জায়গা থেকে চিঠি আসতে লাগল অভিনন্দন জানিয়ে। দিদিরা লিখলে, আমাদের সেই ছোট্ট একরত্তি খোদন টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে খেলছে, একথা ভাবতেই ভারি মজা লাগছে। কাকারা উৎসাহ দিয়ে

খামে চিঠি লিখলে,—খোদন টেনিস চ্যাম্পিয়ান হয়েছে, সত্যি আনন্দের কথা। আমাদেরও তাকে উপহার দিয়ে উৎসাহিত করা উচিত।

জ্যাঠামশাই লিখলেন,—আমাদের খোদন টেনিস খেলা দেখিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে—সেটা আমাদের বংশের গৌরবের কথা। আমরাও তাকে উপযুক্ত উপহার দেব।

খোদন এই সব চিঠি সাতদিন ধরে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াল। তারপর সেই অমূল্য চিঠিগুলি বাঁধিয়ে পড়ার ঘরে টাঙিয়ে রাখলে। সেই সঙ্গে থাকল খোদনের টেনিস র‍্যাকেট-হাতে দণ্ডায়মানের সেই অপরূপ ভঙ্গির ছবি। যে ওর পড়ার ঘরে আসে সেই ছবি দেখে আর চিঠি পড়ে তারিফ করে।

খোদন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে জল্পনা-কল্পনা করে পুজোর সময় কে কী উপহার দেবে। জ্যাঠামশাই কী উপহার দেবেন, কাকারা পার্সেল করে কে কী জিনিস পাঠিয়ে দেবেন, দিদিরা নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ি থেকে খোদনের নামে কত রকম মজার জিনিস লোক মারফত পাঠিয়ে দেবেন—সেই সব কথা আলোচনা করে ওদের আনন্দের পরিসীমা থাকে না!

খোদন মনে মনে বেশ কিছু আঁচ করে নেয়।

জ্যাঠামশাই আসাম অঞ্চলে রয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই মটকার পাঞ্জাবি আর গরদের ধুতি পাঠাবেন। এক কাকা রয়েছে লক্ষ্ণৌতে। তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত নাগরা আর জরির সাজ-পোশাক পাঠাবেন। সেটা পরলে ঠিক নবাবের মতো দেখাবে। সেই লক্ষ্ণৌ শহরের সাজ-পোশাক পরে একটি ফোটো তুলতে হবে। সেই বেশভূষা দেখে স্কুলের ছেলেরা তাকে চিনতেই পারবে না। দিদিরা কেউ রয়েছেন জয়পুরে, কেউ কটকে আবার কেউ বোম্বেতে। পুজোর সময় কত রকম সাজ-পোশাক যে তার আসবে, হিসেব করে সামাল দিতে পারে না সে। আরও সব কাকারা রয়েছেন চারিদিকে ছড়িয়ে। সেই ছড়ানো দেশের সব উপহার কুড়িয়ে যে ভাণ্ডারে জমবে তাতে নিত্যি নতুন বেশভূষার নব কলেবর ধারণ করা চলবে।

এ ছাড়া পিসিমাদের কথা তো বলাই হয়নি। পিসিমারা আবার পুজোর সময় কী সাজ-পোষাক পাঠাবেন সেটা সত্যি গবেষণার বিষয়।

খোদনের বন্ধু বঙ্কা বললে,—পুজোর সময় সব দেশের সাজ যদি তার নামে আসে তাহলে আমরা একটা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করতে পারি। ড্রেসারের

কাছে আর আলাদা ড্রেস ভাড়া করতে হবে না। রানা প্রতাপ কী শিবাজী, ঝাঁসির রানি কি প্রতাপাদিত্য; সাজাহান কী বঙ্গে বর্গী। চল, আজ থেকেই রিহার্সাল শুরু করা যাক।

বঙ্কার এই প্রস্তাবে ছেলের দল ভারি লাফালাফি শুরু করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে পুজোর ছুটিতে একটি ঐতিহাসিক নাটক অভিনয় করবার প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। কিন্তু গোলমাল শুরু হল কে কী পার্ট নেবে তাই নিয়ে। সবাই সেরা ভূমিকায় নামতে ঝুঁকে পড়ল। কেন না, তাতে দেখাবার মতো সাজ-পোশাক পরা চলবে। মাথায় মুকুট, উষ্ণীষ অথবা তাজ। এ প্রলোভন ত্যাগ করতে চট করে কেউ রাজি নয়। শেষকালে ঠিক হল—যে সব চাইতে বেশি চাঁদা দেবে সেই পার্ট পাবে।

বঙ্কার বাড়ির অবস্থা ভালো। সেই জন্যে ছেলে মহলে তার ডাঁট একটু বেশি। সে মাথা দুলিয়ে বললে,—আচ্ছা, দেখা যাক, কে কী রকম চাঁদা দেয়। নৈবিদ্যের চিনির মতো আমি সবাইকার কিছু বাড়িয়ে দিয়ে মাত করে নেব।

খোদন ফোঁস করে উঠে বললে,—তোমরা যদি এই রকম রেষারেষি করো তাহলে আমি আমার পোশাকগুলো

আর থিয়েটারে কাউকে পরতে দেব না।

এই নিয়ে সকলে দু'দিন মুখ গোমরা করে বসে রইল।

নাটকের মহলা একেবারে বন্ধ।

ইতিমধ্যে যারা পার্ট মুখস্থ করে বসে আছে—তারা এখানে ওখানে গাছতলায়, পুকুর ধারে, খেলার মাঠে আর বন-বাদাড়ে অ্যাকটিং করে বেড়াতে লাগল। পার্ট না বললে তাদের পেটের ভাত হজম হয় না। রাত্তিরে ঘুমের ভেতরও অনেকে অভিনয়ের স্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠতে লাগল। এদের সবাইকার জন্যে বাড়ির লোক চিন্তিত হয়ে উঠল। শেষকালে পাড়ার একজন নাট্যরসিক দাদাশ্রেণির লোক ছেলেদের সব বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে দিলে। বললে,—চাঁদা বেশি দিলেই তোমরা বড় পার্ট পাবে—কখনও হতে পারে না। অভিনয়ের যোগ্যতা অনুসারে ভূমিকা নির্বাচন হবে। এতে আর কেউ কথা বলতে পারবে না।

তখন ছেলেরা সকলেই এই কথা মেনে নিলে।

এইবার পুরোদমে চলল নাটকের মহলা।

ছোটদের চিৎকারে পাড়ায় কান পাতে কার সাধ্যি।

পাড়ার মাতব্বরেরা থানায় খবর দিয়ে এই কানে-

তালা-লাগা চিৎকার বন্ধ করবে কী না—এই কথা সবাই ভাবতে লাগল।

ওদিকে ছেলেরা মাঝে মাঝে এসে খোদনকে খোঁচাতে লাগল—ওরে খোদন, তোর পুজোর পোশাক এল? সবগুলো এলে তবে তো ঠিক করতে হবে—কার কী ড্রেস হবে?

ছেলেদের উৎসাহের কিছুমাত্র কমতি নেই।

ইতিমধ্যে তারা সিন ভাড়া করে ফেলেছে। নাটক অভিনয় করতে পাঁচটি সিনের প্রয়োজন হবে। এ ছাড়া উইংগস, আর ড্রপসিন তো আছেই।

কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ যে আজও এসে পৌঁছুল না। তখন ছেলেরা স্থানীয় ডাকঘরে পালা করে হানা দিতে শুরু করল।

পিয়নের সেই ভদ্রলোকের এককথা! দাদাবাবু পার্সেল এলে তো দেব! না এলে কোত্থেকে আপনাদের ড্রেস মিলবে। তার চাইতে আপনারা কুমোরটুলিতে ফরমাস দিন।

হুঁ! কুমোরটুলিত ড্রেস! যত সব ইয়ে—! পোশাক আনতে যত দেরি হচ্ছে—ছেলেরা অ্যাকটিং তত চড়িয়ে দিচ্ছে! পাড়ার লোকেরা তত 'প্রাণ গেল' বলে কানে

তুলো গুঁজে, ঘরের জানালা বন্ধ করে শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ করছে!

অবশেষে একদিন দুপুরবেলায় পিয়ন এসে জানালে, খোদনের নামে একটি পার্সেল এসে পৌঁছেছে।

ছেলের দলের লাফালাফি সেদিন দেখে কে! সবুর সইছে না কারও! কোন পার্টির ড্রেস এল কে জানে? কে সে Lucky Dog!

সক্কলে দল বেঁধে হাজির হল পোস্ট-অফিসে। রেজিস্ট্রি হয়ে পার্সেল এসেছে।

খোদন সই করে প্যাকেটটি হাতে নিল। অমনি চারদিক থেকে জয়ধ্বনি উঠল। বঙ্কা বুদ্ধি করে পকেটে কাঁচি নিয়ে এসেছিল। তক্ষুনি পোস্ট-অফিসের বারান্দায় প্যাকেটটি খোলা হল। ভেতরে আরেকটি প্যাকেট। ভেতর থেকে একটা চিঠি পড়ল।

সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই চিঠির ওপর। চিঠিখানা লিখেছেন জ্যাঠামশাই—

বাবাজীবন খোদন,

তুমি টেনিস খেলায় সুনাম অর্জন করিয়া আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। তাই

পুজোর সময় তোমার নামে এক ডজন টেনিস সার্ট পাঠাইলাম। আশা করি, ইহা পাইয়া তুমি বিশেষ আনন্দিত হইবে। তুমি আমার ভূরি ভূরি আর্শীবাদ গ্রহণ করো। প্রাপ্তি সংবাদ দিও।

ইতি—

নিত্যআশীর্বাদক

জ্যাঠামশাই

চিঠি পড়ে ছেলেরা গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল! এই ঘটনার দিন দুয়েক পর আর একটি প্যাকেট। এসেছে বড় কাকাবাবুর কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন—

স্নেহের খোদন,

খেলার ভেতর দিয়ে নিজের স্বাস্থ্য উন্নতি করো। তোমার ফোটো আরও বহুবার খবরের কাগজে প্রকাশিত হোক—এই আমরা চাই।

পুজোর উপহার হিসাবে তোমার জন্যে এক ডজন টেনিস স্যু পাঠালাম। আশা করি তোমার কাজে লাগবে। ইতি—

শুভার্থী

বড়কাকা

তারপরও আর একটি পার্সেল—
তাতে চিঠি পাওয়া গেল—পিসিমার।

প্রাণাধিক খোদন,

তোমার ফোটো কাগজে দেখিয়া আমরা যে কত আনন্দিত হইয়াছি সেকথা ক্ষুদ্র পত্রে লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। তোমার জন্যে তোমার পিসামহাশয় অর্ডার দিয়া দুইটি টেনিস র‍্যাকেট তৈরি করাইয়াছেন। উহা পার্সেল করিয়া পাঠানো হইল। যদি পারো, ছুটিতে একবার এখানে বেড়াতে আসিও। ইতি—

আশীর্বাদিকা
পিসিমা

ছেলের দল মিটিং করে সেই দিনই পুজোতে নাটক অভিনয় স্থগিত রাখবার প্রস্তাব গ্রহণ করল।

মন্দির প্রবেশ

পলকুদের বাড়িতে আর কোনও আইন চলবে না। ঠাকুমা যে রায় দেবেন সেইটেই থাকবে সকলের মাথার ওপর।

পলকুর ঠাকুমার একটু ছোঁয়া-ছুঁয়ি বাছ-বিছার আছে। সেই জন্যে পলকুর মা-বাবা থেকে শুরু করে সবাই তটস্থ হয়ে থাকে কখন খুঁত বের হয়ে পড়ে তাদের আচারে-ব্যাবহারে। তাহলে কি আর রক্ষে আছে?

ঠাকুমা কাউকে ছেড়ে কথা কইবার লোক নন।

পান থেকে চুন খসে পড়লে তিনি একেবারে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে তুলবেন।

পলকুর বাবা তো নাম করা হাকিম। কিন্তু বাইরেই যা হম্বি-তম্বি! তাঁর হুমকিতে নাকি বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

সে শোনা কথা বই তো নয়! আইন-আদালতে আর কে খোঁজ করতে গেছে বলো! সেই জাঁদরেল হাকিম পলকুর বাবা বাড়ির ভেতর মায়ের কাছে একেবারে

কেঁচোটি। ওখানে আর ট্যাঁ-ফোঁ করবার যো নেই।

আদালত থেকে ফিরে এসে সাত জাতের ছোঁয়া সাজ-পোশাক ছেড়ে গঙ্গা জলের ছিটে দিয়ে তবে মায়ের ঘরে ঢুকতে পারেন। আর না এসে উপায়ও নেই, সেইখানেই জলখাবারের ব্যবস্থা কি না!

জাঁদরেল হাকিম হলে কী হবে—মায়ের কাছে এখনও সেই খোকাটি! তাই প্রতিদিন আদালত থেকে ফিরে এসে মায়ের কাছে খাবার চেয়ে নিয়ে খেতে হবে। এই বাড়ির চিরকেলে প্রথা।

একদিন পলকুর কী কুবুদ্ধি হয়েছিল সে তার মায়ের কাছে গিয়ে বললে, আট আনা পয়সা দাও না মা, ম্যাচ দেখতে যাব।

পলকুর মা শিউরে উঠে বললেন,—ওরে বাবা! আমি কিছু জানিনে! তোর ঠাকুরমার কাছে যা না।

পলকু ভয়ে ভয়ে বললে,—ঠাকুমা যদি বারণ করেন?

মা মুচকি হেসে বললেন,—বারণ করলে যাবে না, ঠাকুমার কথার ওপর আবার কথা নাকি?

সেদিন পলকু অসীম সাহসভরে ঠাকুমার কাছে

একটা আধুলি চেয়ে বসল। ঠাকুমার মেজাজটা সেদিন কেন যেন ভালো ছিল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে—ঠাকুমার সই পুরী থেকে জগন্নাথের চরণামৃত এনেছিলেন। সেই চরণামৃত জিবে ঠেকিয়ে আর মাথায় ছুঁয়ে বলেছিলেন,—কলকাতায় একেবারে ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছি, যতসব খ্রেষ্টানি কাণ্ড! জগন্নাথের চরণামৃত পেয়ে প্রাণটা বাঁচল।

কাজেই পলকুর বরাত ভালোই বলতে হবে। ঠাকুমার কাছ থেকে ম্যাচ দেখবার জন্যে আধুলি তো পেলেই, তাছাড়া আরও একটি ঝকঝকে টাকা পেল মিষ্টি খাওয়ার জন্যে।

সেদিন পলকুই বা কে আর দিল্লির বাদশাই বা কে? মজাসে ম্যাচ দেখে, হোটেলে খাবার খেয়ে ভুরু নাচাতে নাচাতে বাড়ি ফিরল।

ঠাকুমা জিগ্যেস করলেন,—হ্যাঁরে পলকু, কী কী খাবার খেলি বল তো?

পলকু জবাব দেয়, ভারি ভালো জিনিস খেয়েছি ঠাকুমা! গরম গরম মুরগীর কাটলেট!—বলেই জিবে এক কামড়!

একেই বলে—যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়!

ঠাকুমা ততক্ষণে চোখ কপালে তুলে ফেলেছেন,—কী বললি, কী বললি হতভাগা? আমি জগন্নাথের চরণামৃত খেয়ে খুশি মনে তোকে একটা টাকা দিলাম মিষ্টি খেতে.....আর তুই কিনা মুরগির কাটলেট মুখে পুরে দিলি! শিগগির নুনজল খা....বমি করতে হবে আমার সামনে।

পলকু ঘাবড়ে গিয়ে জবাব দিলে,—আমার কী দোষ ঠাকুমা? আমি খেতে চাইনি। ওই হোঁৎকা আমায় জোর করে ধরে হোটেলে নিয়ে গেল। আমি কত বললাম ঠাকুমা রাগ করবে, খাব না—

ঠাকুমা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন,—বললেন, হুঁ! এই বেলা বুঝি হোঁৎকার দোষ হল। তুই একটু আগেই বলেছিলি না, ভারি ভালো জিনিস খেয়েছি ঠাকুমা! তখন তোর হোঁৎকা কোথায় ছিল রে হতভাগা! আগে কর বমি—

সত্যি নুনজল খেয়ে পলকুকে বমি করতে হল। তাতেই কি নিস্তার আছে? জামা-কাপড় ছেড়ে রাত্তিরে গিয়ে পুকুরে নামতে হল। সেইখানেই একশ আটটা ডুব দিয়ে, গোবর খেয়ে তবে ছাড়ান পায়! এই জাতীয়

শাস্তি বাড়ির লোককে হামেশাই পেতে হয়। সেই জন্যেই ছোটবড়ো সবাই ঠাকুমার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে।

বাড়িতে একটা ছোকরা চাকর আছে। নাম তার বিচ্ছু। সেই ছোকরার সঙ্গে তো ঠাকুমার খিটমিটি লেগেই আছে।

বেহালার এক অঞ্চলে পলকুদের বাড়ি। অনেকখানি জমি নিয়ে পলকুর বাবা বাড়ি করেছেন। তাতে বাগান আছে, পুকুর আছে, অনেক ফুল আর ফলের গাছ আছে। ঠাকুমার পুজোর যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেই জন্যেই এই সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বিচ্ছু ছোকরার ওপর ভার আছে—রোজ সকালে উঠে পুজোর ফুল তুলে ঠাকুমার কাছে বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু পুজোর ফুল তোলারও অনেক আইন আছে। ঠাকুমা সে সব ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বিচ্ছু প্রায়ই ভুল করে আর বকুনি খায়।

বেলগাছে কাঁটা আছে—কাজেই বেলপাতা তাকেই গাছে উঠে সংগ্রহ করতে হবে। পুকুরে পদ্ম ফুল ফোটে। অন্য কারও পক্ষে তা তোলা শক্ত। কাজেই

জলে নেমে বিচ্ছুকেই সেই পদ্ম ফুল জোগাড় করে নিয়ে আসতে হবে। শিউলি ফুল মাটিতে ঝরে। কাজেই সে ফুল মাটিতে কুড়িয়ে নেওয়া চলবে। কিন্তু গন্ধরাজ ফুল যদি তুলতে গিয়ে মাটিতে পড়ে—সেটি আর পুজোয় লাগবে না। সারাদিন ধরে সে জন্যে বিচ্ছুকে বকুনি খেতে হবে।

ঠাকুমার এইরকম অনেক অলিখিত আইন আছে।

সেদিন আঁকশি দিয়ে স্থলপদ্ম তুলতে গিয়ে বিচ্ছু একটা বড় ফুল মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, আর পড়বি তো পড় একেবারে ঠাকুমার সামনে! ঠাকুমা চোখ কপালে তুলে চিৎকার করে উঠে বললেন,—কেন তুই মাটির ফুল সাজিতে রাখলি, বল হতভাগা?

বিচ্ছু বললে,—বাঃ রে! যখন শিউলি ফুল মাটি থেকে তুলি, তখন তুমি কিছু বলো না! যখন গাছের ওপর থেকে বেলপাতা মাটিতে ফেলেদি, তখন কোনও কথা ওঠে না! আজ একটা স্থলপদ্ম মাটিতে পড়ে গেছে—তাতে কী দোষ হল ঠাকুমা?

ঠাকুমা বলেন,—স্থলপদ্ম মাটিতে পড়লে পুজোয় লাগে না।

বিচ্ছু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়,—যদি শিউলি ফুল আর বেলপাতা মাটিতে পড়লেও পুজোয় দেওয়া চলে—তবে স্থলপদ্মই বা দেওয়া চলবে না কেন?

ঠাকুমা অমনি চিৎকার করে ওঠেন, অ্যা! ওই ছোঁড়া আমায় পুজোর নিয়ম শেখাতে আসে? আমি আর এ সংসারে থাকব না, আজই কাশী চলে যাব—

তখন পলকুদের মা-বাবা এসে বিচ্ছুকে খুব গালাগাল দেয়; তারপর অনেক সাধ্যসাধনার পর ঠাকুমা ঠান্ডা হন।

এই ভাবে পলকুদের বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে।

এই তো সেদিনের কথা। পলকুর মা তাঁর দাদাকে নিয়ে কী রকম বিপদে পড়েছিলেন—সেই গল্প বলি।

পলকুর এক মামা মিলিটারিতে কাজ করতেন। বহুকাল কলকাতার বাইরে ছিলেন। দু'দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছিলেন, আবার দূর দেশে কোথায় যেন চলে যাবেন। পলকুর মায়ের সেই দাদা এসেছেন বোনের সঙ্গে দেখা করতে। একেবারে সেই মিলিটারি বেশে গটগট করে বোনের শোওয়ার ঘরে গিয়ে হাজির।

কাণ্ড দেখে বাড়িসুদ্ধ লোক একেবারে ভয়ে তটস্থ, ঠাকুমা যদি কিছু বলে বসেন। কুটুম্ব মানুষ...তাহলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে যাবে!

ছেলেরা মেয়েরা ঠাকুমাকে নানা কথায় ভুলিয়ে বাগানে বেড়াতে নিয়ে গেল।

সবাই ভাবলে, যাক ফাঁড়াটা বুঝি এই ভাবেই কাটল। কিন্তু বিধি বাম।

গটগট করে পলকুর মিলিটারি মামা নেমে আসছেন—ঠাকুমা একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলেন।

বিপদের ওপর বিপদ! সেই মিলিটারি মামা আবার ঠাকুমাকে প্রণাম করে বসলে। ঠাকুমা মুহূর্তমধ্যে যেন একবারে স্ট্যাচু হয়ে গেলেন।

তারপর সেই মিলিটারি মামা যেই বাড়ির বাইরে চলে গেলেন—অমনি ঠাকুমা একেবারে ফেটে পড়লেন—বউমা, তোমার কী আক্কেল বলো তো!—এইভাবে ঠাকুমার বচন আরম্ভ হল। কাজেই শেষ পর্যন্ত মাকে সমস্ত তোশক, বালিশ, মশারি, বিছানার চাদর সুদ্ধ সবকিছু নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ডোবাতে হল। এতেই কিন্তু শুদ্ধিপর্ব সমাধা হল না। পলকুর মাকে

সেদিন গোটা বাড়িময় সিঁড়ি অবধি গোবর-জল দিয়ে আগাগোড়া ধুয়ে ফেলতে হল।

পলকুর মা শুধু একবার ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন,—আমারই তো দাদা, অজাত-কুজাত তো আর নয় মা, আপনি এত গোবরজল দিতে বলছেন কেন?

বারুদে যেন দেশলাইয়ের কাঁঠি ছুঁয়ে দেওয়া হল। ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস করে উঠলেন।

—তুমি বলছ কী বউমা? মিলিটারি লোক কোথায় ষাঁড়ের ডালনা খেয়ে এসেছে কে জানে! নাঃ, আর জাতিধর্ম রইল না; কাশীতে চলে যাওয়াই ভালো।

সেদিন পলকুর বাবা আদালত থেকে ফিরে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজে খানিকটা গোবর আর চোনা খেয়ে ফেলে অনেক করে বুঝিয়ে তবে মাকে ঠান্ডা করেন।

এই ঘটনার দিনকয়েক পরের কথা। পলকু তাদের স্কুলের খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরছিল। সেদিন ওর মনটা খুবই খুশি ছিল। কেন না, খেলায় ওরা তিন গোলে জিতেছে।

শিস দিতে দিতে এগিয়ে আসছিল পথ দিয়ে। হঠাৎ

ঝম ঝম করে বৃষ্টি এল। পলকু আর দাঁড়াল না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই বাড়ির দিকে রওনা হল। হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে—একটা কুকুর ওর সঙ্গে আসছে।

কুকুরটি কোথাও দাঁড়াতে রাজি নয়। পলকু প্রথমে ভেবেছিল ওর যেমন বৃষ্টিতে ভেজবার শখ হয়েছে কুকুরটারও বোধ করি তাই। খানিকটা পথ চলবার পরই সে নিজের রাস্তা বেছে নেবে। কিন্তু পলকুর অনুমান যে ভুল সেটা খানিকটা বাদেই টের পাওয়া গেল। পলকু যত ভেজে—কুকুরটাও তত ভেজে। সেও আনন্দ করে পথ চলেছে, কুকুরটারও মতলবও তাই।

দু-একবার ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে তাড়া করল, কিন্তু জানোয়ারটা খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়ায় বটে, আবার পলকু চলতে থাকলেই সে আনন্দ করে পেছন পেছন আসতে থাকে।

পলকু দেখলে মহা বিপদ! এই রকম সহচর তার জুটে থাক পলকু তা মোটেই চায় না।

অবিশ্যি পৌরাণিক কাহিনিতে পড়েছে যে প্রত্যেক দেবতার একটি করে বাহন থাকে। যেমন মহাদেবের

ষাঁড়, মা দুর্গার সিংহ, সরস্বতীর হাঁস, লক্ষ্মীর প্যাঁচা ইত্যাদি। কিন্তু পলকু-দেবতার একটি কুকুর বাহন জুটে যাক—একথা সে কখনওই জেগে বা স্বপ্নে কল্পনা করেনি। তার ওপর বাড়িতে রয়েছেন ঠাকুমা। এই বাহনকে নিয়ে বাড়ি ঢুকলে কি নিস্তার আছে? তবু বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে এগুতেই হল। নাঃ কুকুর কিছুতেই সঙ্গ ছাড়বে না।

মহাপ্রস্থানের পথে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বরাবর গিয়েছিলেন কুকুরের ছদ্মবেশে ধর্ম। কিন্তু বেহালার পথ ধরে পলকুর সঙ্গে সেই ছদ্মবেশী ধর্মরাজ হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে চলেছেন একথা কোনও মতেই বিশ্বাস করা চলে না। কিন্তু বিশ্বাস করা এক, আর তার হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া অন্য কথা। আর সত্যি কথা বলতে কী পলকুর মায়া পড়েছিল কুকুরটার ওপর। ওকে ভরসা করেই তো এতটা পথ চলে এল, এখন কি ওটাকে তাড়ানো যায়? তখন বাধ্য হয়ে দুজনে ভিজতে ভিজতে বাড়ির দরজায় এসে হাজির হল। কিন্তু না, সামনে দিয়ে কোনও মতেই ঢোকা চলবে না। ঠাকুমা দেখতে পেলে আর আস্ত রাখবে না। তখন

পলকু বাড়ির পেছন দিককার বাগানের ধারে গিয়ে হাজির হল। নিজের বেড়া ডিঙিয়ে ওপাশে গিয়ে পড়ল। কুকুরটা কুঁই কুঁই করে সবিনয় নিবেদনে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করলে। তখন পলকু ওকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলে। চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল পুকুরের ধারে গোয়াল ঘরের দিকে। সেখানে একটা শব্দ শুনে পলকু থমকে দাঁড়াল।

না, ভয়ের কিছু নয়, বিচ্ছুটা বেরিয়ে আসছে। বোধ করি গোরুর জাবনা দিতে ঢুকেছিল।

বিচ্ছুটাকে দেখতে পেয়ে পলকু যেন স্বর্গ খুঁজে পেল। তাকে সব কথা খুলে বললে। কিন্তু বিচ্ছু উত্তর দিলে,—কুকুরটাকে বাড়িতে ঢুকিয়ে ভালো কাজ করোনি দাদাবাবু, ঠাক্‌মা দেখতে পেলে একেবারে আমাদের দুজনকার নামই ভুলিয়ে দেবে।

পলকু বললে,—তাহলে এক কাজ কর, একটা দড়ি দিয়ে ওকে গোয়াল ঘরেই বেঁধে রাখ। আর মায়ের কাছ থেকে খানিকটা মাছভাত এনে ওকে খাইয়ে দে।

বিচ্ছু আঁতকে উঠে বললে,—তুমি বলছ কী দাদাবাবু, গোয়াল ঘরে আমি মাছভাত আনব? ঠাকমা তাহলে

আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

বিচ্ছু মুখে অনিচ্ছা প্রকাশ করল বটে, তবে ঝাপড়া একটা গাছতলায় দড়ি দিয়ে ওকে বেঁধে রাখল, এখানে বৃষ্টি পড়ছে না এই যা রক্ষে।

পলকুর মা সব শুনে বললেন,—তুই করেছিস কী? কালকে সকালবেলা উনি আমাদের সবাইকে দূর দূর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

পলকু মনে একটু সাহস এনে উত্তর দিলে,—না না, তাড়াবেন না। দোহাই তোমারা মা, কুকুরটা সারাপথ ভিজে শীত আর ক্ষিদেয় কাঁপছে, তুমি ওকে একটু মাছভাত দাও।

পলকুর মা কিছুতেই ছেলের আবদার ঠেলে দিতে পারলেন না। বিচ্ছুকে দিয়ে কুকুরটার জন্যে ভাত পাঠিয়ে দিলেন।

সেদিন রাত্রে পলকুর আর ভালো ঘুম হয় না। বারে বারে জেগে ওঠে। কুকুরটা বুঝি একা একা কাঁদছে।

মা শুধোলেন,—কীরে পলকু, উসখুস করছিস কেন? তোর ঘুম পাচ্ছে না?

পলকু মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জিগ্যেস করে,—আচ্ছা মা, কুকুরটা একা ভয় পাবে না তো?

মা জবাব দেন,—পাগল ছেলে! কুকুর বেড়াল কখনও ভয় পায়? তবে কাল সকালবেলা সবাইকে ভয়ে কাঠ হয়ে যেতে হবে।

সত্যি তাই।

পরদিন ভোরবেলা ঠাকুমা যখন পুকুরে স্নান করতে চলেছেন, হঠাৎ গাছতলায় কুকুরের কুঁই কুঁই শব্দে চমকে দাঁড়ালেন। তারপর চিৎকার করে উঠলেন,—কী অনাছিষ্টি! কী ঘেন্না! এই রাস্তার কুকুরটাকে আবার গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে? তার পরেই ঠাকুমা এমন মরাকান্না জুড়ে দিলেন যে বাড়িসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গেল।

সবাই এসে হাজির হল পুকুরের ধারে। পলকুর বাবা আগেই পলকুর মায়ের কাছে সব কথা শুনেছিলেন। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।

ঠাকুমা বললেন,—আচ্ছা খোকা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে মিটি-মিটি হাসছিস? এই তেলেভাজা কুকুরটা যদি বাড়িতে থাকে তবে আজই আমি কাশী চলে যাব।

তুই আমায় সেইখানে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দে।

এমন সময় একটা মজার কাণ্ড ঘটল। পলকুর ছোট বোন ময়না ছুটতে ছুটতে এসে কুকুরটার গলা জড়িয়ে ধরল, তারপর বললে,—ঠাকুমা, আমি এটাকে পুষব!

ময়না আবার ঠাকুমার খুব ন্যাওটা। তাকে তো তিনি বকতে পারেন না। তবু মুখ ঝামটা দিয়ে ফোড়ন কাটলেন,—হুঁ, পুষবি। এই তেলেভাজা কুকুরকে বুঝি কেউ পোষে?

পলকু এতক্ষণে ভয়ে ভয়ে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। এইবার একটু সাহস পেয়ে বললে,—তেলেভাজা নয় ঠাকুমা, একেবারে ঘিয়ে ভাজা। ওর কথা বলবার ধরন দেখে পলকুর বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন।

ঠাকুমা আবার দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলেন,—হুঁ, একেবারে যমের অরুচি। ওকে বিদেয় করো! বিদেয় করো!

শেষ পর্যন্ত পলকুর জন্য যতটা না হোক—ময়নার আবদারেই কুকুরটা বাড়িতে টিকে গেল! কিন্তু সেই সঙ্গে ঠাকুমার দেওয়া নামটাও তার রয়ে গেল।

সবাই ওকে ডাকে 'যমের অরুচি' বলে। হয়তো ঠাকুমাকে খুশি করবার জন্যেই।

এরপর আর এক দিনের ঘটনা—ঠাকুমা স্নান করে এক ঘটি জল এনে দাওয়ার ওপর রেখে ঘরের ভেতর গেছেন—ভিজে কাপড় ছাড়তে। এমন সময় যমের অরুচিটা কোত্থেকে ছুটে এসে ঘটির জল চক্ চক্ করে খেতে শুরু করে দিলে।

ঠাকুমা এই কাণ্ড দেখে পা ছড়িয়ে মরাকান্না শুরু করে দিলেন।

ঠাকুমা হুমকি দিয়ে উঠলেন,—হয় তোমরা ওকে অবিলম্বে তাড়িয়ে দাও না হয় আমাকে আজই কাশী পাঠাও। আমি আর এই পাপপুরীতে থাকব না।

কারও মুখে কথা সরে না। পলকু ভাবে এইবার আর কুকুরটাকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। আর তোরই তো দোষ বাপু। জল খাবার আর জায়গা পেলিনে। একেবারে ঠাকমার ঘটিতে গিয়ে মুখ দিয়েছিস! এখন ব্রহ্মার ভাই বিষ্ণু এলেও তোকে রক্ষা করতে পারবে না।

কিন্তু ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের দরকার হল না, শেষ

পর্যন্ত ময়না এসেই সব গোলমাল মিটিয়ে দিলে।

প্রথমেই কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে যমের অরুচির পিঠে। বললে,—খবরদার আমার ঠাকমার ঘটিতে যদি কখনও মুখ দিয়েছিস—তাহলে কেটে কুচি কুচি করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব! চল, তোর আজ খাওয়া বন্ধ—

এই বলে কুকুরটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। ঠাকুমা ছড়ানো পা গুটিয়ে নিলেন। বাড়ির সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

এরই মধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটল। পলকুর বাবা একদিন আদালত থেকে ফিরে একেবারে বিছানা নিলেন। একেবারে শক্ত অসুখে পড়ে গেলেন তিনি।

ডাক্তার-বৈদ্যি ক্রমাগত আনাগোনা করতে লাগল বাড়িতে। ঠাকুমা হুমকি দিয়ে বললেন,—আমি তখুনি বলেছিলাম, ওই অলুক্ষুণে কুকুরটাকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না। ওই যমের অরুচির জন্যই এত কাণ্ড। আমার খোকার অসুখের জন্য ওই নেড়ি কুত্তাই দায়ী।

ঠাকুমা দিনরাত কান্নাকাটি করতে লাগলেন। পুজোর ঘরে শিবঠাকুরের কাছে সোনার বেলপাতা মানত

করলেন, মাথা খুঁড়ে বললেন, খোকা ভালো হয়ে উঠলে তিনি বুকের রক্ত দেবেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর পলকুর বাবা ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠলেন, তারপর চিকিৎসকের নির্দেশে একদিন অন্নপথ্য করলেন। ঠাকুমা সোনার বেলপাতা গড়িয়ে শিবঠাকুরের পুজো করলেন।

সেই দিন রাত্তিরে একটা বুক ফাটা চিৎকারে বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙে গেল। সবাই দুর দুর করে নীচে নেমে এল। চিৎকার শোনা যাচ্ছে পুজোর ঘর থেকে।

ঠাকুর চাকর আর বাড়ির সবাই সেখানে গিয়ে একেবারে শিউরে উঠল।

একটা চোর এসেছিল—সোনার বেলপাতা চুরি করতে। তার একটা ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে যমের অরুচি, সেই নেড়ি কুকুরটা! রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে।

ঠাকুমাই সকলের আগে কথা বললেন,—ভাগ্যিস যমের অরুচিটা ছিল। তাই তো আমার সোনার বেলপাত বেঁচে গেল। নেড়িটার বুদ্ধি আছে বলতে হবে।

ততক্ষণে ঠাকুর চাকর গিয়ে চোরটাকে জাপটে ধরে

একেবারে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছে!

পলকু এইবার সাহস করে এগিয়ে এসে শুধোলে,— আচ্ছা ঠাকুমা, যমের অরুচিটা যে তোমার ঠাকুর ঘরে ঢুকল? তোমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

মুখে যেন মধু ঢেলে ঠাকুমা জবাব দিলেন,—আহা! ওকে তোরা বলিস নি! কেষ্টর জীব—থাক না।

জন্ম ১৯০২। মৃত্যু ১৯৯৪।
আসল নাম অখিল নিয়োগী।
'যুগান্তর' পত্রিকায় ছোটদের পাততাড়ি
বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন।
শুধুই ছোটদের জন্য আজীবন সাহিত্যচর্চা
করেছেন। ছোটদের নিয়ে সংগঠনও
করেছেন আজীবন।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—হাসির হল্লা, দেশে দেশে
মোর ঘর আছে, বাবুই বাসা বোর্ডিং, সাত
সমুদ্র তেরো নদীর পারে ও গল্প সঞ্চয়ন।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত বিদ্যাসাগর
পুরস্কারে সম্মানিত।

প্রচ্ছদ **সুদীপ্ত মণ্ডল**

নিতবরের নাকাল, সেয়ানে-সেয়ানে, চেখে দেখা, ও আমি আগেই জানতুম, নেমন্তন্ন নাও বাগিয়ে, বেড়ালের বোনপো, পরীক্ষা কী ঝকমারি, পুজোর উপহার আর মন্দির প্রবেশ।

প্রত্যেকটাই এক-একখানা অঢেল হাসির উড়নতুবড়ি!